মাসিক

আলোকধারা

রেজিঃ নং - ২৭২
১৮শ বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা
এপ্রিল ২০১৩ ঈসায়ী

তাসাউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

হযরত শাহসুফী সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারীর (ক) রওজা শরীফ

মরক্কোয় তিযানিয়্যা ত্বরিকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত শায়খ আহমদ তিযানী (র) -এর মাজার শরীফের দৃশ্য ...

রওজা শরীফের বহির্ভাগের দৃশ্য

মাজার শরীফের অভ্যন্তরভাগ

মাসিক
আলোকধারা
THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF TASAWWUF STUDIES

রেজিঃ নং ২৭২, ১৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

এপ্রিল- ২০১৩ ঈসায়ী
জমাঃ আউয়াল-জমাঃ সানী- ১৪৩৪ হিজরী
চৈত্র-বৈশাখ ১৪১৯ বাংলা

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

সম্পাদক
মোঃ মাহবুব উল আলম

যোগাযোগঃ
লেখা সংক্রান্তঃ 01818 749076
01716 385052
মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্তঃ 01819 380850
01711 335691

মূল্য : ১৫ টাকা
(US $=2)

সম্পাদকীয় যোগাযোগঃ
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
৫, সিডিএ, সি/এ (তেতলা) মোমিন রোড,
চট্টগ্রাম। ফোন : ৬১৮৮৫৫

শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট এর একটি প্রকাশনা

Web:
www.sufimaizbhandari. org
E-mail:
sufialokdhara@gmail.com

সূচী

■ সম্পাদকীয়: তকদির ও হালাল রুজি প্রসঙ্গ ---------- ২
■ তওহীদী সূর্যের আলোর প্রতিবিম্ব হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা (কঃ)
– জাবেদ বিন আলম ---------- ৩
■ ত্বরিকায়ে তিযানিয়্যার প্রতিষ্ঠাতা সিদি আবু আব্বাস আহমদ আল-তিযানি (রঃ)
– মোঃ মাহবুব উল আলম ---------- ৫
■ আঈনায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারী 'রাদ্বিয়ানুল্লহ বারী'
– অনুবাদঃ বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর ---------- ৭
■ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে 'ইবাদাত'
– ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ ছিদ্দিকী ---------- ১৪
■ আধ্যাত্মিক পথ ও পাথেয়
–অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী --- ১৯
■ হযরত ছৈয়দ রাহাত উল্লাহ শাহ (র.)
–ছালেহ সুফিয়ান ফরহাদাবাদী মাইজভাণ্ডারী ---------- ২৩
■ "পবিত্রতা এবং অজুর তাত্ত্বিক আলোচনা"
– শেখ আবুল বাসার ---------- ২৭
■ সম্পদ ও ক্ষমতার দায়
–মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ---------- ৩১
■ হযরত ফোদায়েল আয়াজ (রাহি.)'র সাথে খলিফা হারুন-অর রশীদ এর সাক্ষাৎকার
–অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান ---------- ৩৪
■ বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর নির্বিলাস জীবন
– মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ---------- ৩৫
■ "রাহ্বারে আলম হযরত শাহ্সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (মঃ) আল্ মাইজভাণ্ডারীর একটি ভাষণ"
– অধ্যাপক কাজী ফরিদ উদ্দিন আখতার ---------- ৪০
■ স্মৃতিতে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)
– স্মৃতিচারণ করেনঃ ডা. কিউ এম অহিদুল আলম ---------- ৪৩
■ রমেশ শীলের ফকিরিতে মৌলানা রুমীর প্রভাব
– মোঃ গোলাম রসুল----------৪৬
■ সংগঠন সংবাদ ---------- ৪৮

সম্পাদকীয়...

তকদির ও হালাল রুজি প্রসঙ্গ

"আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি তা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি (১৫:২১)"।

উপর্যুক্ত আয়াতটির ধারণা থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে সব কিছুই নির্দিষ্ট পরিমাণ, বিধান ও সম্ভাবনা অনুসারে ঘটে। কোন বস্তু সৃষ্টির পর তার পূর্ণতা তকদির বা নির্দিষ্ট বিধান মতে সম্ভাবনা অনুসারে সঠিক পরিমাণে হয়। এ তকদির আল্লাহ্ পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান আছে। মানুষ মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র নিয়মানুযায়ী জীবন পরিচালনা করে পূর্ণতা লাভের সম্ভাব্য ক্ষমতা অর্জন করে এবং এ প্রদত্ত ক্ষমতার নাম তকদির। মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, কিন্তু তবুও সে তকদিরের নিয়মের অধীন। মনীষীগণ তকদিরকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। ১. তকদিরে হকিকি বা অপরিবর্তনীয় তকদির, ২. তকদিরে মালিকি বা ক্ষেত্র বিশেষে পরিবর্তনশীল তকদির। মানুষ চেষ্টা ও কর্ম দ্বারা যেসব বিষয়ের কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে না মওলানা রুমীর (রঃ) মতে তা-ই তকদিরে হকিকি, যেমন জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি। তকদিরে হকিকিকে দর্শনের ভাষায় চিরন্তন ও স্থান-কালের উর্ধ্বে (লা-মাকান) বলা হয়। অপর পক্ষে আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্ভাবনাগুলোর মধ্যে যে পরিবর্তন হয়, তার নাম তকদিরে মালিকি। মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা সম্ভাবনাগুলোর মধ্যে বিকল্প গ্রহণ করতঃ চেষ্টার মাধ্যমে যে ফল লাভ করে, তা-ই তকদিরে মালিকি। প্রত্যেক ধর্মই তকদিরে বিশ্বাস করে। সাধারণভাবে মানুষ বিশ্বাস করে যে, তকদিরে যা লিখিত আছে, তার দ্বারাই সে পরিচালিত হয় এবং তকদিরলিপি অনুযায়ী মানুষের জীবনের সকল কার্য ও ঘটনা ঘটে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মানুষ তার ইচ্ছা, চিন্তাশক্তি ও কর্মদক্ষতার পরিমাণ বা সম্ভাবনা অনুযায়ী কর্মের জন্য দায়ী। যার যতটুকু বুদ্ধি বা জ্ঞান তার সে পরিমাণ দায়িত্ব। মানুষ স্বল্প বুদ্ধি, স্বল্প দৃষ্টি, স্বল্প জ্ঞান ও স্বল্প চিন্তাশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং কতগুলো নিয়মনীতি অনুসারে জীবন-যাপন করে। এ নিয়ম-নীতির নির্দিষ্ট মাত্রা, পরিমাণ ও সম্ভাবনাকেই তকদির বলা হয়। মানুষের জন্মের পূর্বেই সমস্ত বিষয় তার তকদিরলিপিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তদনুযায়ী এ বিশ্বে তার কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে–এ কথা যথার্থ। তকদির হলো একটি বিশাল গণ্ডি বা বৃত্ত যার বাইরে যাবার ক্ষমতা মানুষের নেই। এ বৃত্তের মাঝেই মানুষ কর্মসাধন করে থাকে। জ্ঞান ও শক্তির ভেতর বিকল্প নির্বাচনের স্বাধীনতা মানুষের আছে এবং সৎ অসৎ-ভালো-মন্দ-মঙ্গল-অমঙ্গল-পার্থক্য করার ক্ষমতাও মানুষের আছে। ফলে মানুষ তার তকদির-বৃত্তের মাঝে স্বাধীনভাবে কর্ম সম্পাদন করে কর্মের ফল পুরস্কার বা শাস্তি নিজেই তৈরী করে।

হাদিসে আছে, "আত্ তকদিরো লা-ইয়া রুদ্দু" অর্থাৎ অদৃষ্টে যা লিখা আছে তা খণ্ডন করা যায় না। এ হাদিসের মর্মার্থ যথার্থ। কারণ, তকদিরলিপির গণ্ডির বাইরে কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই। সকল কর্ম তকদিরের আওতার মধ্যেই সম্পাদিত হয় এবং সেই কর্মের পরিমাণই মানুষের উপার্জন। এ হাদিস দ্বারা যদি প্রতিটি কর্ম নির্ধারিত বলে ধরা হয়, তবে 'ইন্নমাল আমালু বিন্ নিয়্যাত' অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও কর্ম অনুযায়ী বরকত (বর্ধিষ্ণুতা)-এ হাদিসটি মর্মার্থ কী দাঁড়ায়? নির্ধারিত হলে বরকত আসবে কী করে? কাজেই তকদির সকল কর্মের সমষ্টি। এ সমষ্টি থেকে বাছাই করে কর্ম সাধিত হয়।

এখানে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, তকদির লিপির ফলে আল্লাহ্‌ই জীবিকার সংস্থান করেন বলতে যদি এ কথা বুঝায় যে, মানুষ যা কিছু উপার্জন করে তা আল্লাহ্ থেকে প্রাপ্ত, তাহলে উপার্জনে হালাল ও হারামের প্রশ্ন থাকে না। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, নিপীড়ন, লুট যে ভাবেই পাওয়া যাক না কেন তা আল্লাহ্‌র সংস্থান বলেই বুঝা যাবে! (নাউজুবিল্লাহ্)। এমন অবস্থা তো সম্পূর্ণ অসম্ভব। সকল সম্ভাবনা তকদিরলিপিতে রয়েছে। স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী সে সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা মানুষের দায়িত্ব। হালাল উপায়ে বাস্তবায়ন অনুমোদিত; হারাম উপায়ে বাস্তবায়ন করলে পাপে জড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে। ভ্রূণ যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখন আল্লাহ্ বিশেষ কুদরতে তার খাদ্য পৌঁছে দেন। এ ভ্রূণটি যখন পৃথিবীর আলোতে আসে, তখন বেশী কোন পরিশ্রম না করে শুধু ঠোঁট সঞ্চালন 'কর্ম' করে মায়ের স্তন থেকে খাদ্য পায়। তখন এ শিশুটিই বয়ঃপ্রাপ্ত হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার না করলে খাদ্য যোগাড় করতে পারে না। কাজেই খাদ্যের সকল সংস্থান-আল্লাহ্ তকদিরে রেখেছেন। মানুষকে নিজের চেষ্টা দ্বারা হালাল কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সংস্থানকে কাজে লাগিয়ে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্‌সূফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) 'কবুতরের মতো বেছে বেছে খাবার' নসিহত করেছেন। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হালাল খাবার তাগিদ দিয়েছেন। তাঁদের এসব তাগিদ অনুসরণে 'তকদিরে মালিকীর' ঐসব বৈশিষ্ট্য হাসিল করা সম্ভব, যা মানুষকে পুণ্যময় হয়ে উঠার পরিবেশ যোগায়। আল্লাহ্ আমাদেরকে এসব সু-বৈশিষ্ট্য হাসিলের তৌফিক দিন।

তওহীদী সূর্যের আলোর প্রতিবিম্ব হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা (কঃ)

● জাবেদ বিন আলম ●

১. হযরত গাউসুল আযম বিলবেরাসত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) শিশুকাল থেকেই ভাব-বিহ্বল ছিলেন। গৃহাভ্যন্তরে, ফসলের মাঠে, মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষে সর্বত্রই তিনি নিশ্চুপ একাকীত্ব পছন্দ করতেন। অল্প বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে ধ্যানমগ্নতা তীব্রতর হয়ে ওঠে। তাঁর চালচলন, কথাবার্তা ছিল সীমিত এবং পরিমিত। প্রায়শঃ তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন। শিশুসুলভ চপলতা, চঞ্চলতা, গল্প-গুজব অথবা খেলাধুলার প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না বললেই চলে। সর্বাবস্থায় তিনি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত কেবলা আলমের (কঃ) দিব্যদৃষ্টির তদারকিতে থাকাকেই উৎকৃষ্ট সাধনা মনে করতেন। মূলতঃ হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলার জন্মের সপ্তম দিবসে আকিকা উদ্‌যাপনের দিন সুবাসিত কাপড়ে আবৃত করে পিতা সৈয়দ আবদুল করিম (রহঃ) উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন সমেত পূর্ণিমার চাঁদসম সুন্দর শিশুপুত্রকে নিয়ে পিতৃব্য হযরত গাউসুল আযম শাহসূফি মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ শাহ সাহেব কেবলার (কঃ) খেদমতে হাজির হন। হযরত কেবলা আলম (কঃ) স্বীয় পবিত্র হস্তদ্বয় প্রসারিত করে কোলে নিয়ে উর্দু ভাষায় বলতে লাগলেন, "ইয়েহ্ হামারে বাগ্‌কা গুলে গোলাব হ্যায়, হযরত ইউসুফ (আঃ) কা চেহরা ইছ্‌মে আয়া হ্যায়। উছ্‌কো আজিজ রাখো। ম্যায়নে উছ্‌কা নাম গোলামুর রহমান রাখা।" সেদিন পিতৃব্য হযরত কেবলা কাবার শুভদৃষ্টি আকর্ষণের সময় থেকে বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবার মধ্যে মাশুকের যে প্রেমবীণার সূত্রপাত ঘটেছে, শৈশব, কৈশোর তারুণ্যে তিনি সেই বীণার আকর্ষণেই নিজেকে সবসময় মত্ত রেখেছেন। বাবা ভাণ্ডারীর (কঃ) শৈশবের এ অবস্থা সম্পর্কে গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তির ভাষায় বলা যায়, "তোমার সৌন্দর্যের বাতিতে আমি পতঙ্গ সেজেছি, একটা স্ফুলিঙ্গ উপস্থিত হয়েছে এবং আমাকে আমার থেকে নিয়ে গেছে।" আল্লামা রুমীর ভাষায় বলা যায়, "আমার সত্তা ভিতরে-বাইরে, উপরে নিচে, সর্বতোভাবে তাঁর (প্রিয়তমের) ভিতরে নিমজ্জিত।" বস্তুতঃ বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবা তাঁর আকিকার দিন থেকেই সর্বতোভাবে হযরত কেবলার ভিতরে নিমজ্জিত হবার পরম সৌভাগ্য অর্জন করেন।

২. হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবার ইবাদত, মোরাকাবা, মোশাহাদা, নির্জনতা, নীরবতা, গৃহত্যাগ, সংসার বিরাগ প্রত্যেকটির মূলে তাঁর নিজের ভাষায়, "বহু বছর ধরে তোমার (আল্লাহ্) সন্ধানে আছি' আমার প্রাপ্য এখনও তুমি পূর্ণ করছ না। আমি দৈব বাণীযোগে জানলাম, তোমার দুয়ার হতে কেহ নৈরাশ হয়ে ফিরে যায় নাই, যে ব্যক্তি তোমার দুয়ারে আশার আলো নিয়ে হাজির হয়েছে, সে তার মনজিল মকছুদে পৌঁছবেই।" হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলার (কঃ) স্বহস্তে লিখা উর্দু কবিতার অনুবাদ থেকে জানা যায় তাঁর ফরিয়াদ ছিল মাত্র একটি; শুধু মহান আল্লাহ্‌র জাতে নূরের মধ্যে বিলীন হওয়া যা থেকে চিরন্তনতায় (বকা) তাঁর অবস্থান অবিসংবাদিত থাকবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) বেরিয়া ইবাদতে পাহাড়, জঙ্গল, নদী সমুদ্রে পরিভ্রমণরত হলেন। যে প্রেমানলে উন্মত্ত হয়ে বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) সংসার বিরাগী হয়ে অজানা অচেনা দুর্গম পথ ভ্রমণে যান, সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়াজের ভাষায় তা হচ্ছে, "তোমার প্রেমের আগুন এখন আমার জলয়ে পতিত হয়েছে, আমার সকল আরাম ও সুখ বরবাদ হয়ে গেছে।" এক কথায় হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (কঃ) তারুণ্য কেটেছে "মওলার প্রেমাগুণে পোড়ার" মধ্য দিয়ে।

৩. বাবা ভাণ্ডারীর (কঃ) সংসার বিমুখতা দূর করার লক্ষ্যে তেইশ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু বিবাহিত জীবনের জাগতিকতা তাঁকে মোহাবিষ্ট করতে পারেনি। তিনি পূর্ববৎ পিতৃব্য হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সমীপে নিজেকে সমর্পিত রাখতে ব্যস্ত থাকতেন। বিয়ের কয়েক দিন পরই হযরত কেবলা কাবার আদেশ নিয়ে তিনি চট্টগ্রাম শহরে মোহসেনীয়া মাদ্রাসায় পাঠ গ্রহণ নিমিত্তে চলে যান। ছুটির সময় বাড়ী আসলেও তিনি হযরত কেবলার খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। স্বগৃহে তাঁকে আটকিয়ে রাখা সম্ভব হতো না। এতে তাঁর পিতা-মাতা নিশ্চিত হলেন যে, বাবা ভাণ্ডারীর (কঃ) পক্ষে গৎ-বাঁধা সংসার জীবন যাপন করা সম্ভব হবে না। পঁচিশ বৎসরে উপনীত হলে তিনি জামায়াতে উলা পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হন। মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষা প্রদানের জন্য তিনি পিতৃব্য হযরত কেবলা কাবার অনুমতি প্রার্থনার্থে বাড়ী আসেন। পরীক্ষার অনুমতি নেয়ারকালে হযরত কেবলা আলম ফরিয়াদির উত্তর দিয়েছিলেন এ ভাষায়, "হ্যাঁ বাচা, তাঁর পরীক্ষা হয়ে গেছে।" এর পর পীরানে পীরের (কঃ) জুব্বা মোবারক পরিধান করিয়ে দিয়ে বাবা ভাণ্ডারী (কঃ)কে বিদায় দিলেন। উলা পরীক্ষার তৃতীয় দিবসে বাবা ভাণ্ডারীর

(কঃ) মধ্যে হঠাৎ প্রেম জজবা শুরু হলে তাঁর আর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি। এরপর বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) কে মাইজভাণ্ডার শরীফে এনে হযরত কেবলা কাবার (কঃ) খেদমতে হাজির করা হয়। মহান পিতৃব্য হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তাঁকে এক গ্লাস সরবত পান করিয়ে দেন। এতে তাঁর প্রেমাবেগ (মউজ) নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে লেখাপড়ায় আর মনোনিবেশ করেননি। কারণ মাশুকের প্রেম নেশায় তিনি এতো তন্ময় থাকতেন যে, লেখা-পড়া তাঁর কাছে 'হেজাবুল আকবর' হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। দিলের পর্দা খুলে (কশ্‌ফ) যাবার কারণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই তাঁর নিকট দৃশ্যমান হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় একাডেমিক লেখা-পড়া তাঁর নিকট গৌণ হয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজন ও সহপাঠিরা তাঁকে অধ্যয়নের কথা বললে তিনি বলতেন, "হে মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছাত্রগণ! তোমরা যা কিছু লাভ করেছ, তার সবই তোমাদেরকে ধাঁধায় ফেলেছে। শত কেতাব ও এর পত্রাবলী অগ্নিতে নিক্ষেপ কর এবং প্রিয়তমের প্রিয় আনন্দেই নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ কর।" কার্যতঃ মাদ্রাসায় অধ্যয়নের পাঠ বাদ দিয়ে তিনি হযরত কেবলার নূরানী দৃষ্টিতে নিজেকে সর্বক্ষণ ব্যস্ত রাখেন। এখানে তিনি অহরহ ঐশী প্রেম-শরাব পানরত থাকেন। এতে তাঁর প্রেমতৃষ্ণা বাড়তে থাকে। এ প্রসঙ্গে খাজা গরীবে নেওয়াজের (কঃ) ভাষায় বলা যায়, "স্বচ্ছ পেয়ালা থেকে মঈন সব শরাবই পান করেছে, তবু তার অনুসন্ধিৎসু তৃষ্ণা নিবারিত হয়নি এখনো।" অর্থাৎ প্রেম নেশায় উন্মত্ত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) শুধু প্রেম শরাব পানে তৃপ্ত নন, তিনি পান পাত্রও নিজের দখলে নিতে একাগ্র হয়ে পড়েন।

৪. কঠোর সাধনা, একাগ্রতা 'প্রেম বর্শার প্রতি মুহূর্তের আঘাতে' ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন প্রেমিকের হৃদয় ধারণ করে বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) আত্মসমর্পণে 'হৃদয় থেকে আরশ পর্যন্ত' শত স্থানে 'ইয়াহু তকবির' ধ্বনি ঝঙ্কৃত করে আত্মস্থ করে নেন আপন মুর্শিদ, মওলা মাশুককে। কালক্রমে পর্দার অন্তরালে থেকে তিনি অদৃশ্যের সুলতান সেজে নিজের এশ্‌ক নিয়েই আশেকের নামে খেলা শুরু করেন। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে তিনি ঐশী প্রেমাসর জমজমাট করে তোলেন। তাঁর দরবারে প্রতিনিয়ত অজস্র লোকের সমাগম ঘটতে থাকে। এ সকল ব্যক্তির মধ্যে আশেক, ভক্ত, ফরিয়াদীর পাশাপাশি অসংখ্য দর্শনার্থী কৃপা লাভের আশায় নিয়মিত গমনাগমন করতে থাকেন। কিন্তু বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) নির্বাক, নিঃশব্দে চাদরাবৃত (মোজাম্মেল) হয়ে থাকেন। এ ধরনের অবস্থাকে আল্লামা রুমীর ভাষায় বলা যায়, "আমি যদি গোপন রহস্য প্রকাশ করি, তবে জাহান ওলট-পালট হয়ে যাবে।" মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে যিনি নীরব থেকে সেই শাশ্বত মর্যাদা অর্জন করেছেন এবং তওহীদী সূর্যের আলো বিকিরণ করেছেন তিনি হলেন গাউসুল আযম বিল বেরাসত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা (কঃ)।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর ভবিষ্যত কর্মসূচী প্রণয়নের লক্ষ্যে ধারণা/পরামর্শ আহ্বান

আপনারা অবগত আছেন যে, শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট মানবতার সেবায় নিয়োজিত একটি বহুমুখী কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান। এই ট্রাস্ট জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন ধরণের ও প্রকৃতির কর্মসূচী গ্রহণ করে আসছে। এর ব্যাপক কর্মকান্ড পরিচালনা ও কর্মসূচী গ্রহণের লক্ষ্যে ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ তাদের পরামর্শ/ধারণা/প্রস্তাব/আইডিয়া সংগ্রহপূর্বক এগুবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ ব্যাপারে আপনার যে কোন ধারণা, সৃজনশীল কর্মপন্থা বা প্রস্তাব লিখিতভাবে নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। স্মরণ করা যেতে পারে আপনার ক্ষুদ্র পরামর্শও আমাদেরকে বিপুলভাবে উপকৃত করবে। এ ব্যাপারে আপনার সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

যোগাযোগের ঠিকানা:

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট

গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ্ শরীফ
সৈয়দ সলিমুল্লাহ্ শাহ্ রোড, বিবিরহাট
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১।
ফোন: ০৩১-২৫৮৪৩২৫
মোবাইল: ০১৮২৭-৮৫১৯৯০
ই-মেইল: szhtrust@gmail.com

ত্বরিকায়ে তিযানিয়্যার প্রতিষ্ঠাতা সিদি আবু আব্বাস আহমদ আল-তিযানি (রঃ)

ত্বরিকায়ে তিযানিয়্যার প্রতিষ্ঠাতা সিদি আবু আব্বাস আহমদ আল-তিযানী (রঃ) আফ্রিকা মহাদেশের আলজেরীয় মরুদ্যান নগরী আইন মাদীনাতে ১১৫০ হিজরীর (১৭৩৭ খৃঃ) ১২ই সফর জন্মগ্রহণ করেন। নবী নন্দিনী হযরত ফাতিমা জোহরার (রঃ) প্রথম সন্তান হযরত হাসান (রঃ)-এর উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর বংশ লতিকা নবীজী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) পর্যন্ত বিস্তৃত। মরক্কোর প্রতিষ্ঠাতা মাওলায়ে ইদ্রিস-ও তাঁর বংশ লতিকাসূত্রে সংশ্লিষ্ট। তাঁর পিতা হযরত সিদি মোহাম্মদ বিন আল মুক্তার বিন আহমদ বিন মোহাম্মদ বিন সালাম মরক্কোর আবদা কবিলার লোক। মরক্কোয় পর্তুগীজ আগ্রাসনের পর তাঁর দাদা সেখান থেকে হিজরত করে আইন মাদীনাতে চলে আসেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সর্বজন স্বীকৃত শ্রদ্ধেয় আলেম। তাঁর দাদার দৈহিক সৌন্দর্য এতোই জ্যোতির্ময় ছিল যে, দর্শক মাত্রই বিমোহিত হয়ে আত্মহারা হয়ে যেতো এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য উন্মাদপ্রায় হয়ে যেতো। ফলে তিনি মুখমণ্ডল আবৃত করেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে যেতেন। তাঁর মা আয়েশা ছিলেন মোহাম্মদ বিন সানৌসীর (সানৌসিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আল-সানৌসী নন) কন্যা। অত্যন্ত দয়াবতী ও উদার হৃদয়া মহিলা হিসেবে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল।

হযরত শায়খ তিযানি তাঁর পারিবারিক ও স্থানিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে সাত বছর বয়ঃক্রমের পূর্বেই পবিত্র কুরআন হেফজ করেন এবং অতঃপর ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ, হাদীস, তফসীর, তেলাওয়াত, তজবীদ, ব্যাকরণ বা নাহু এবং সাহিত্য বা আদাব সমেত, ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুউচ্চ উৎকর্ষ সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর অন্যতম শিক্ষক সিদি মুবারক ইবনে বা আফিয়্যা মিদাবী আল-তিযানীর কাছে তিনি সিদি খলিলের মুখতাসর এবং ইবনে রুশদের মুকাদ্দামা, আল-আখদারীর কিতাবুল ইবাদা অধ্যয়ন করেন।

জ্ঞান অর্জনের প্রবল তৃষ্ণায় তিনি ফেজ নগরীতে গমন করেন, যা ঐ সময়ের কেবল রাজনৈতিক রাজধানী নয়, বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় রাজধানী হিসেবেও মশহুর ছিল। প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী অনেক সুফি-দরবেশও ঐ সময়ে ফেজ নগরীতে অবস্থান করছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মরক্কোর সুফি জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত আল-তায়ীব (রঃ) বিন মোহাম্মদ আল-শরীফ (মৃত্যু ১১৮০হিঃ/১৭৬৮ খ্রিঃ)-এর সংস্পর্শে এসে প্রভূত রূহানী উরুজ হাসিল করেন। হযরত আল-তায়ীব (রঃ) ঐ সময়ে ওয়াযযানিয়া সুফি ত্বরিকার প্রধান ছিলেন এবং তিনি ছিলেন মশহুর সাধক শায়খ তুহামীর (রঃ) ছাত্র। তিনি শায়খ আহমদ তিযানীকে (রঃ) সুফি ইলম শিক্ষাদানের অনুমতি দেন। কিন্তু শায়খ তিযানী তাতে অস্বীকৃতি জানান এই বলে যে, আধ্যাত্মিক পীর হিসেবে আবির্ভূত হবার পূর্বে তাঁর আরো কঠোর সাধনা ও রূহানী উৎকর্ষের প্রয়োজন রয়েছে। সিদি আবদুল্লাহ বিন আরবী আল মাযাউ (মৃত্যু ১১৮৮ হিজরী) তাঁর ছাত্রের সিদ্ধান্তে অত্যন্ত অভিভূত হন এবং বলেন যে, আল্লাহ নিজে তাঁকে হেদায়েতের পথে চালাচ্ছেন। হযরত তিযানী (রঃ) অন্যত্র যাবার পূর্বে হযরত সিদি আবদুল্লাহ (রঃ) নিজ হাতে তাঁকে গোসল করান। হযরত সিদি আহমদ আল-তাবাস (রঃ) (মৃত্যু ১২০৪ হিঃ) ও তাঁর আধ্যাত্মিক উরুজ সম্পর্কে পূর্বাভাষ দেন। শায়খ তিযানী (রঃ) কাদেরিয়া ত্বরিকার তালিম নেন সিদি আহমদ আল ইয়েমনীর (রঃ) কাছ থেকে এবং আবু আবদুল্লাহ সিদি মোহাম্মদ আল তিযানীর (রঃ) কাছ থেকে নেন নাসিরিয়া ত্বরিকার তালিম। হযরত আবু আব্বাস আহমদ আল হাবিব আল-সিজিল মাসী (রঃ) (মৃত্যু ১১৬৫ হিঃ) তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং তাঁর মুখের উপর তদীয় মুখ রেখে একটি গুপ্ত নাম শিক্ষা দেন। হযরত তিযানী (রঃ) এসব ত্বরিকায় মারেফতী অনুমতি লাভ করলেও তাঁর নিজস্ব আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে এগুলোকে বিবেচনা করা হয় না। তবে তিযানিয়্যা ত্বরিকার বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর প্রাথমিক এসব সংশ্রব, অনুশীলন ও অধ্যয়নের প্রভাব ছিল। এসব ত্বরিকা বনেদী সুফিবাদের উপর গুরুত্ব দিত, যার শেকড় কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে গভীরভাবে প্রোথিত। সব কিছুর মৌলিক সংমিশ্রণেই গড়ে উঠেছে তাযিনিয়্যা ত্বরিকা।

হযরত শায়খ আহমদ তিযানী (রঃ) এতদ্ব্যতীত সিদি মোহাম্মদ আল-ওয়ানখিলি (মৃত্যু ১১৮৫ হিঃ), বিখ্যাত কুতুব সিদি আবদুল কাদির বিন মোহাম্মদ আল-আবাইয়াদ (রঃ)-এর কাছে শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি আলজিরিয়ার বিভিন্ন স্থান, মিশর ও হেযাযের বিভিন্ন উচ্চ মর্তবার জ্ঞানী ও সুফি সাধকদের সান্নিধ্যে আসেন এবং তফসীর ও হাদীসের গূঢ় রহস্য সন্ধানে ব্রতী হন। ১১৮৭ হিঃ/ ১৭৭৪ খৃঃ রমজান মাসে তিনি পবিত্র মক্কা আগমন করেন এবং উচ্চ মর্তবার গুণাবলী

সম্পন্ন ব্যক্তিদের তালাশে প্রবৃত্ত হন। এ সময়ে তিনি ভারতবর্ষের রহস্যময় দরবেশ হযরত আহমদ বিন আবদুল্লাহ্ আল-হিন্দির (রঃ) সমীপবর্তী হন। তিনি তাঁর ভৃত্য ব্যতীত অন্য কারো সাথে কথা না বলতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। তবে তাঁর গৃহে আল-তিযানির উপস্থিতির কথা জেনে তিনি বার্তা পাঠালেন, "তুমি আমার ইলম, গুপ্ত বিদ্যা, তোহফা ও নূরের উত্তরাধিকারী"। এছাড়া তাঁকে আরো জানালেন যে, তিনি দিন কয়েকের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করবেন এবং তিনি যেন, মদীনা শরীফে গেলে কুতুব মোহাম্মদ আল সাম্মানের (রঃ) সাথে সাক্ষাৎ করেন। মদীনায় নবীজীর (দঃ) রওজা শরীফ জেয়ারত শেষে তিনি শায়খ মোহাম্মদ আবদুল করিম আল-সাম্মানের (রঃ) সাথে দেখা করেন। তিনি খালওয়াতিয়া ত্বরিকার অনুসারী ছিলেন। হজ্বব্রত পালন শেষে কায়রোতে মাহমুদ আল কুর্দী (রঃ) সমেত অনেক আধ্যাত্ম মনীষার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

হযরত শায়খ আহমদ তিযানী (রঃ) এবং তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সাথী ১২১৩ হিঃ/ ১৭৯৮ খৃঃ ফেজ শহরে আগমন করেন। দেশের সুলতান মাওলায়ে সুলায়মান তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণীদের সমবিভ্যহারে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে জ্ঞানের নিবিড় সখ্য গড়ে উঠে। সুলতান তাঁর মধ্যে শরিয়ত ও মারিফাতের বিরল সমন্বয় প্রত্যক্ষ করেন। ত্বরিকায়ে মোহাম্মদীয়া বা নবীজীর পথ অনুসরণ করে তিনি ইসলামী বিধি-বিধানের বৃত্তে সুফিবাদের যে বিকাশ ঘটান, তা সুলতানকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। ফেজ শহরে তাঁর হাজার হাজার শিষ্য ও অনুগামীর সম্মিলন ঘটে। আল হারাযেম আল-বারাদা, মোহাম্মদ ঘালী এবং মোহাম্মদ আল হাফিজের মতো অনেক অনুসারীকে তিনি মুকাদ্দাম বা প্রচারক হিসেবে সুদূর হিযায, মৌরিতানিয়াও প্রেরণ করেন। জীবনের উপান্তে এসে তিনি ১২১৫ হিঃ/ ১৮০০ খৃস্টাব্দে তিযানী যাবিয়্যার নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ১২৩০ হিঃ/ ১৮১৫ খ্রস্টাব্দে তিনি ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে---রাজিউন)। তাঁর ত্বরিকায়ে মোহাম্মদীয়ার হাজার হাজার অনুসারী বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করে আছেন। আধ্যাত্ম অভিভাবক বা পীর-মুর্শিদের গুরু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে হলে আত্মশোধন এবং জ্ঞান ও সাধনার জগতে কিভাবে উল্কার মতো বিরামহীনভাবে ছুটে নিজেকে নিঃশেষ করতে হয়, হযরত তিযানী (রঃ)-এর জীবন ও কৃতি এর অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তথ্য সূত্র : ইন্টারনেট।

গ্রন্থনা ও অনুবাদঃ মোঃ মাহবুব উল আলম।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর মহান কর্মকান্ডে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করতে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের প্রতি নিবেদন

আমরা অবগত আছি যে, শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত সংগঠনসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিভিন্নভাবে এর কার্যক্রমের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। এ ছাড়াও এ সকল কর্মকান্ডের বাইরে অনেক ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন যাঁরা এই ট্রাস্ট সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন না।

ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ মাইজভাণ্ডার দরবারের আশেক-ভক্তবৃন্দের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে কাজ করতে আগ্রহী বিভিন্ন শ্রেণীর (পেশাজীবী ও প্রশাসনিক কাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞ যেমন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সরকারী/বেসরকারী কর্মকর্তা, হিসাবরক্ষক ও ব্যাংকার, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট, শিক্ষাবিদ অথবা অনুরূপ) ব্যক্তিবর্গকে ট্রাস্টের মহান কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার সুবিধার্থে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ অনুগ্রহপূর্বক তাঁদের নাম, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, টেলিফোন নাম্বার এবং যে ক্ষেত্রে কাজ করতে আগ্রহী তা উল্লেখপূর্বক নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট

গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ্ শরীফ
সৈয়দ সলিমুল্লাহ্ শাহ্ রোড, বিবিরহাট
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১।
ফোনঃ ০৩১-২৫৮৪৩২৫
মোবাইলঃ ০১৮২৭-৮৫১৯৯০
ই-মেইলঃ szhtrust@gmail.com

আঈনায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারী 'রাদ্বিয়ানুহুল বারী'

মূলঃ

যুগের মনসূর, প্রেমাস্পদের নূরী আননের প্রেমবিভোর, শরীয়তের মহাজ্ঞানী, মারফতের বিজ্ঞানী, ত্বরিকত বিদ্যার পরিবেষ্টনকারী, হাকিকত বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ সর্বসম্মানিত বাহরুল উলূম জনাব মাওলানা আবুল বরাকাত সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্দুল গণি আচ্ছাফী আল্ মকবূল কাঞ্চনপুরী কদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহুন্‌নূরী

ভাষান্তরঃ

বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর

আরবী ফার্সী, উর্দূ ও হিন্দি ভাষার সমন্বয়ে এক অনন্য গ্রন্থ 'আয়নায়ে বারী' ইসলাম ধর্মদর্শনের নিখাদ দর্শন কলমের আঁচড়ে যুক্তি-প্রমাণের দৃঢ় বাঁধনে দীপ্তি ছড়িয়েছে। প্রতি মূহুর্তে চমকের দোলায় চমকে উঠে পাঠক। উন্মোচিত হয় বিবেকের রুদ্ধদ্বার, উদ্বেলিত হয় অনন্ত প্রেমাবেগ। অপসারিত হয় দ্বিত্বের পর্দা। গ্রন্থটি প্রত্যেক খোদা অন্বেষীর জন্য অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার যোগ্য গাইড লাইন। মুরিদ বা উদ্দেশীর জন্য মুরাদ বা উদ্দেশিত। রুপান্তরের চিকিৎসায় একই সাথে ঔষধ, ব্যবস্থাপত্র ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক।

সূফি দর্শন আজ কিছু সংখ্যক মতলববাজের খপ্পরে পড়ে নিজস্ব রূপ-যৌবন তথা স্বকীয়তা হারাতে বসেছে। সূফি বেশধারী ব্যবসায়ীদের প্রতারণায় ফেঁসে দ্বীন-দুনিয়া উভয় কুলহারা মানুষ এ পবিত্র দর্শনকে ঘৃণার থুথু ছিটিয়ে নিচ্ছে গাদায় গাদায়। বিশেষতঃ নিরেট সূফি দর্শনের যুগোপযোগী সংস্করণ মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে নিপতিত মানুষ নিজেদের অজ্ঞাতে মন্দ বলছে মাইজভাণ্ডারীদেরকে। এহেন পরিস্থিতিতে সূফি দর্শন ও মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার নির্ভেজাল দর্শন বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সমীপে তুলে ধরার নিমিত্তে উক্ত গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইলহামী জ্ঞানের সফল ভাষ্যকার বাহরুল উলূম আল্লামা মকবূল রচিত 'আয়নায়ে বারী' বা প্রভু দর্পণ' গ্রন্থটি সূক্ষ্ম জ্ঞানের অতল সমুদ্র। সিন্ধু তলের মুক্তা আহরণ ডুবুরীর পক্ষেই সম্ভব। কৃতি লেখক ও অনুবাদক জনাব বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর অতি সাহসিকতার সাথে উক্ত গ্রন্থের সাবলীল অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন। আলোকধারার পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশ করা হচ্ছে।

সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর যে, এ হাকীকতভাণ্ডার, সূক্ষ্মবিষয়াবলীর কোষাগার, আশেকগণের সহচর, আরিফদের বন্ধুবর, লুকায়িত রহস্যাবলীর বিকাশ, গোপন তত্ত্ব ও তথ্যের প্রকাশকের উপর, যা– আঈনায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারী বা 'গাউসুল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবন চরিত' এ প্রভুর দর্পণ' নামে অভিহিত।

ভূমিকাঃ হেকমতরহস্যের ভাণ্ডারঃ

হাম্‌দে বারী তা'আলাঃ বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম 'অতিশয় দয়ালু ও দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি'

هو الاول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم

'তিনি আদিতে ও অন্তে, ব্যক্তে ও গুপ্তে এবং তিনি সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত।' প্রশংসা সে একক, অদ্বিতীয় ও পূতপবিত্র সত্তার এতটুকুই যথেষ্ট যে, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' বা আল্লাহ ভিন্ন উপাস্য নেই।

غزل

وہی ہے واحد اسکے ہر طرف جلوہ ہے وحدت کا - وہی ہے دو نما منہ پر دھرے سو پردہ کثرت کا

وہی ہے اول و آخر وہی ہے ظاہر و باطن - وہی ہر جا پہ روشن چھپے پردے میں عظمت کا

وہی ہے پردہ رقصان ہے وہی باز نازان ہے - وہی خود شاہد جان ہے وہ درویش عصمت کا

وہی مولائے کل کا ہے وہی ملجائے کل کا ہے - ہے عالم میں وہی تجلی ہر بصر بصارت کا

وہی ہر جا پہ ہے رقصاں جدا ہر اپنی رکھو تم کان - سنو گے ہر طرف سے تین غلغل وحدت کا

وہی ہے نازنیں ہر رنگ میں اس کا ادا کیں ہے - وہی ہے رنگ ہے سب رنگ ہے رنگ اسکے رنگت کا

وہی ہے جلوہ گر بزم دل مقبول میں ہر دم - نہ جانوں کب چکا دے جاں کو لذت ایسی خلوت کا

গযল

সেই একক তার সর্বদিকে দীপ্তি একত্বের,
তিনি দৃশ্যমান মুখে ধরে শতপর্দা বহুত্বের।
সেই আদি-অন্ত, সেই ব্যক্ত-গোপন,
তিনিই সর্বস্থানে বিকাশমান পর্দারাতে মহানত্বের।
সেই বিনাপর্দায় নিত্যমান, মনমোহিনী মিষ্টবচন,
তিনিই আত্মার প্রমাণ ঘোমটা মুখে পবিত্রতার।

সকলের প্রভু তিনি, সকলের আশ্রয়স্থল তিনি;
জগত মাঝে তিনিই মণি, প্রত্যেক চোখ আর জ্যোতির।
সর্বস্থানে সে নিত্যমান, যে দিকে রাখবে কান;
সবদিকে শুনতে পাবে মৃদুগুঞ্জন একত্বের।
তিনি প্রেমাস্পদ, সর্বরূপে তার রঙ্গ বিকাশমান,
তিনিই রঙহীন সর্বরঙে রাঙা রূপ যে তাঁর।
মকবূলের হৃদাসনে তিনি সদা অলংকৃত
না জানি কবে মিটাবে স্বাদ মধু দানে সুমিলনের।

নাতে রাসূলে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা ঃ না'ত বা স্তুতি ঐ জগতকুল সম্রাট, সুস্পষ্ট নিদর্শনাদির ধারক, আল্লাহর পরিপূর্ণ বিকাশ, আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধির এ টুকুই যথেষ্ট যে, 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' বা মুহাম্মদ (দ.) আল্লাহর রাসূল। তাঁর ও তাঁর আল, আসহাব এবং উম্মতের আউলিয়া সকলের প্রতি উত্তম সালাত ও পরিপূর্ণ অভিবাদন প্রতিদান দিবস পর্যন্ত বর্ষিত হোক।

غزل

محمد سر وحدت ہے کوئی راز اس کا کیا سمجھے - اگر عبد خدا سمجھے تو کیا سمجھے خدا سمجھے
اگر حفظ مراتب کا نہ ہوتا درمیاں برزخ - محمد کو خدا سمجھے خدا کو مصطفے سمجھے
وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر ہے وہ باطن - ہے یہ رمز مخفی کوئی اگر سمجھے تو کیا سمجھے
وہی ہے ابتدا سب کا وہی ہے انتہا سب کا - حقیقت میں اسے بے ابتدا و انتہا سمجھے
بھلا میں کیا کہوں تجھ سے وہ کیسا گنج مخفی ہے - لباس بندگی میں تو اسے جلوہ خدا سمجھے
وہی ہے ایک دریائے محیط جلوۂ وحدت - دو عالم کو اسی دریا کا تو اک بلبلا سمجھے
اگر ہے آفتاب لم یزل ذات محمد ہے - دو عالم آفتاب ذات کا اک پرتو سمجھے
خدا و مصطفے دونوں جدا کب ہیں بھلا مقبول - ہو کب وہ واصل مقصود جو انکو جدا سمجھے

গযল

মুহাম্মদ একত্বের রহস্য, তাঁর রহস্য কেউ কি বুঝবে?
যদি খোদার বান্দা বুঝে তবে কি বুঝবে খোদা বুঝবে।
মধ্যখানে যদি না হতো মর্যাদাস্তরে পর্দাখানি,
মুহাম্মদ কে খোদা জানবে খোদাকে মুস্তাফা বুঝবে।
তিনি আদি, তিনি অন্ত তিনিই গুপ্ত আর ব্যক্ত;
এ গোপন রহস্য অতি দুর্বোধ্য কেউ তা কি বুঝবে।
সর্বশুরুতে সে আবার সর্বশেষেও সে,
হাকিকতে তাঁকে অনাদি ও অনন্ত বুঝবে।
কী বলব বল সে যে, কেমন গুপ্ত ভাণ্ডার;
বান্দার পোষাকে তাঁকে আল্লাহর জলওয়া বুঝবে।
একত্ব দীপ্তির তিনিই এক সর্বব্যাপী দরিয়া,
উভয় জগত সে সাগরের এক বুদ্বুদ বুঝবে।
খোদা ও মুস্তাফা ভিন্ন কবে বল মকবূল,
না পৌঁছবে মকসূদ সে, যে তাঁদের ভিন্ন বুঝবে।

ন্যায্য ও সঙ্গত যে, কলমের মুখকে এ অসম্ভব কল্পনা থেকে বিরত রাখবো; অর্থাৎ সাহসিকতার অশ্বের লাগাম হাম্দ-না'তের দুর্গম প্রান্তর থেকে মোড় ঘুরিয়ে নেবো। কেননা, এ অনন্ত ময়দানে অনেকে হারিয়ে গিয়েছে; প্রান্ত পায়নি। সর্বোচ্চ দ্রুতগামী আরোহী, **لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک** 'আপন সত্তার যে প্রশংসা তুমি করেছো, তা শুমার করতে পারিনা' বলে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। এ চিরবসন্তী বাগের গায়েন বুলবুল **العجز عن درک الادراک ادراک** 'প্রভুর রহস্য অনুধাবনে অক্ষম হওয়াই প্রকৃত অনুধাবন' সঙ্গীদের সুরমূর্ছনায় অপারগতা প্রকাশ করেন। মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قل لو کان البحر مدادا لکلمٰت ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمٰت ربی ولو جئنا بمثله مددا.

'বলুন, যদি আমার প্রভুর বাক্যাবলী লেখার জন্য সমুদ্র কালি হয়, তবে অবশ্যই আমার প্রভুর বাক্যাবলী শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং যদিও আমি তদসমান সাহায্যের জন্য আনয়ন করি'। সূরা কাহফ ১০৯নং আয়াত।

غزل

طاقت کہاں جو نعت میں کروں رقم - اس جا پہ لوح تنگ ہے شکستہ ہے قلم
جہاں نبی کہیں کہ لا احصی ثنا علیک - جو افصح العرب ہیں اور ابلغ العجم
جہاں پہ عاجزی کی دم بھرے ہیں بوبکر - جبریل کو طاقت نہیں جہاں پہ مارے دم
جہاں پہ قدسیوں کو لاعلم لنا ہے قول - عقل رسا کا جس جگہ چلتا نہ ہو قدم
با جہل و عجز و لاعلمی بے نہایت اب - مقبول یاں پہ تجھکو کیا پھر مارنا ہے دم

গযল

শক্তি কই পাই হাম্দ না'ত লেখতে?
ফলক সংকীর্ণ কলম বিদীর্ণ এ জগতে।
অক্ষমতা যেথা নবীজির নূরানী মুখেতে,
আরব-আজমে সেরা যিনি উত্তম বাগ্মীতে।
আবু বকরের দীর্ঘশ্বাস অপারগতা প্রকাশে
জিব্রাঈলের নেইকো সাধ্য নিঃশ্বাস ফেলিতে।
'আমাদের জ্ঞান নেই; রব যেথা ফিরিস্তা জগতে,
বিবেকবানের কদম সেথা না পারে চলতে।
অজ্ঞতা, অক্ষমতা ও অনন্ত জ্ঞানহীনতা সত্ত্বে,
মকবূল তব কিবা সাধ্য ফের দম নিতে।

অতঃপর এ নগণ্য, আপাদ মস্তক ত্রুটিপূর্ণ, পাপে মগ্ন আবুল বরাকাত সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্দুলগণি [রক্ষাকারী আল্লাহর সাহায্যে হোক সে ধন্য] আচ্ছাফী বা খাঁটিবন্ধু ও আল মকবুল বা গৃহীত উপাধিতে ভূষিত, ইসলামাবাদী (জন্মস্থানের সূত্রে) হানাফী (মাযহাব সূত্রে) কাদেরী (মশরব সূত্রে) ইবনে হাফেজ সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্দুল ওহাব [আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে দয়া করে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল ও প্রতিদান দিবসে তাঁর অনুগ্রহের ছায়া তলে স্থান দান করুন ফটিকছড়ি থানা সংলগ্ন ধুরং এর অধিবাসী বর্তমান বাসস্থান কাঞ্চনপুর [আল্লাহ এ অঞ্চলকে ফিৎনা ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন]। এ অধম গাউসিয়া আহমদিয়ার আরশতুল্য দরবারের কুকুরদের পদধূলি। এ পুস্তক রচনার প্রেক্ষাপট ঈনি ভাই ও ইয়াকীনি বন্ধুদের খেদমতে আরয করছি। গাউসে পাকের পদধূলি এ দাসের অন্তরে নিজের অক্ষমতা ও অজ্ঞানতা সত্ত্বেও বিকাশহেতু প্রেমাস্পদ, খোদাপরিচয় লাভকারীগণের সম্রাটদের সম্রাট, নৈকট্যপ্রাপ্তদের প্রাণস্পন্দন, মহান আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি, জগতে আল্লাহর প্রতিবিম্ব, মহামহীম আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত গাউসুল আ'যম বা মহানত্রাণকর্তা সৈয়্যদ আহমদ উল্লাহ আল মাইজভাণ্ডারী 'রব্বিয়ানহুল্লাহুল বারী' এর পবিত্র জীবনচরিত রচনার বাসনা জাগরুক ছিল। তাঁর মহান দরবারে অবনত মস্তকে বেশ কয়েকবার আন্তরিক আবেদন পেশ করি। কিন্তু অনুমতি জ্ঞাপক কোনরূপ ইশারা-ইঙ্গিতও প্রকাশ পায়নি। যেহেতু এ নগণ্যের পরিপূর্ণ আস্থা আছে যে, এ ফয়জবারী বর্ষী দরবার থেকে কোন ব্যক্তি আপন চাওয়ার বেলায় নৈরাশ ফেরেনা, সেহেতু অধম এ বিষয়ে সদা আরযমন্দ ও প্রত্যাশী ছিলাম। যাবৎনা গাউসিয়তের ধারক মহান হযরতের প্রভুর সান্নিধ্যে মহামিলন যাত্রার মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। যখন দানের সমুদ্রে তরঙ্গ এল এবং হুযুর ফয়জভাণ্ডার, আকাশ অধিক উদার, কামিলগণের সরদার, প্রেমাস্পদগণের মূর্তপ্রতীক, রাসূলে আকরম (দ.)'র খলিফা বা প্রতিনিধি হযরত মাওলানা শাহ সৈয়্যদ গোলামুর রহমান সাহেব কিবলা (আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফয়জের ছায়া জগৎবাসীর শিরোপরে স্থায়ী রাখুন) এর মধ্যস্থতায় এ গুরুত্বপূর্ণ কাজে অনুমতির ইঙ্গিত দানে এ নগণ্য বান্দাকে ধন্য ও দয়াসিক্ত করলেন। হায় আল্লাহ! এ সময়ে হযরত হুযুর, ফয়জরাশীতে ভরপুর, যুগের পীরদের পীর, প্রেমিকগণের প্রাণস্পন্দন মাওলানা শাহ সৈয়্যদ আমিনুল হক ওয়াদ্দীন (উভয় জগতের পালনকর্তা আল্লাহ তাঁর রহস্যকে পবিত্র করুন) এর বেসালের মুহূর্ত এসে পড়ল। আস্তানা শরীফের ভক্তকুলের হৃদয়দর্পণকে শারীরিক বিরহ ও মানসিক বিচ্ছেদের পাথরে ভেঙ্গে চুরমার করে গেল। ঈর্ষাকাতার নির্দয় মহাকাল এ টুকুতে তৃপ্ত হয়নি। এ ছাড়াও জগতের হৃদয়বিদারক প্রলয়রূপ ঘটনা অর্থাৎ হযরত গাউসুল্লাহিল আ'যম এর মি'রাজের শুভসংবাদে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র শোকের বন্যা বইয়ে দিল এবং উর্ধ্বজগত তথা আর্শ, কুরছি ও লা-মকানকে আনন্দের গুঞ্জন শুনিয়ে দিল। সঙ্গত কারণেই কলমের যাত্রায় ছেদ পড়ল। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পবিত্র দরবারের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করণে কলমের মুখ স্তব্ধ। ঐ হৃদয় বিষণ্ণ করা ঘটনার বর্ণনায় মসি অবনত মস্তকে হতবল ও বিধস্ত। এ মহান কাজের দুঃসাহস অত্যন্ত বেয়াদবী এবং এ ভয়ঙ্কর পথে বীরত্বের সাথে চলা চরম অশিষ্টতা। এতদসত্ত্বেও **المامور معذور** 'আদিষ্ট অপারগ' মর্মে লিখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সর্বোপরি বিরহ-বিচ্ছেদের আগুনে দগ্ধ হৃদয়ের সান্ত্বনার জন্যও এ কাজ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা ছিলনা।

مثنوی

یادگاری تیرا ہے بہتر مشراب — جو سوا اسکے ہے وہ ہے بس سراب

گل گیا اور ہے گلستاں اب خراب — اب تلاش بوئے گل ہے از گلاب

ایک دن مجنون بیابان میں کہیں — فرقت لیلیٰ میں بیٹھا تھا حزیں

ریگ کاغذ تھا و انگلیاں قلم — نام پاک لیلیٰ کرتا تھا رقم

لوگ جو دیکھے تو پوچھے اس سے یوں — اے شہید عشق لیلیٰ کا زبوں

ریگ میدان پر یہ کیا کرتا رقم — خون دل سے کیا یہ لکھتا دمبدم

کشتہ تیغ جدائی نے کہا — فرقت لیلیٰ کی ہے یہ ماجرا

مدتوں سے کشتہ ہجراں ہوں — ہجرت لیلیٰ میں حالت ہے زبوں

وصل لیلےٰ کا نہیں ملتا ہے راہ — فرقت لیلیٰ سے حالت ہے تباہ

مشق نام پاک لیلےٰ کرتا ہوں — اس سے اب خاطر تسلی دیتا ہوں

فرقت یوسفؑ میں آنکہ یعقوبؑ کا — تھے سدا طالب اسی مطلوب کا

گر نہ ہو دیدار یوسف کا نصیب — بوے پیراہان یوسفؑ ہے طبیب

نام لیلےٰ کا مرے جی جاں ہے — یاد لیلےٰ کا مرے ایمان ہے

জিজ্ঞাসিলাম, কোন কথাটি উৎকৃষ্ট জগত মাঝার?
বললো, বন্ধুর গুণগান শ্রবণ ছাড়া কিছু নয় আর!

তাঁর গুণবর্ণনা সভায় তনুমনে পরিপূর্ণ আদবের সাথে আসতে হয়। তাঁর প্রেমে গোপ্তে-ব্যক্তে মনোপ্রাণ উৎসর্গ করে আসা চাই।

غزل

زبان کلک سے جو نام غوث پاک کا نکلے - جناب عزت جل وعلا سے مرحبا نکلے
نکلتے نام حضرت کی تحیتی طور کا نکلے - تو حسان ثناخواں کیوں نہ ہر دم سرمہ سا نکلے
صریر نوک خامہ کی سماعت سے فرشتوں کی - جماعت وجد میں رقصاں قلم بوسی کو آ نکلے
در و دیوار جو کچھ ہیں ادب سے سر جھکا لیتے - مجالس میں کبھی جو وصف آں غوث خدا نکلے
جہاں پر ذکر پاک حضرت غوث خدا کا ہو - تو رحمت کی یقیناً واں پہ منشور خدا نکلے
دعا مقبول ہوتا ہے جہاں ہو ذکر حضرت کا - جو وقت وصف میں دل سے کسی کے کچھ دعا نکلے
فرشتے بزم حضرت میں سدا ہوتے ہیں عطر پاش - تو خوشبو بزم سے کیونکر نہ عنبر سارا نکلے
نبی مشتاق بزم ذکر حضرت کا ہے یہ محفل - تو کیونکر ہو نہ رشک روضہ رضوان کا نکلے
قلم طوبیٰ کا ہے میرے سیاہی مشک عنبر کا - جو نکلے کلک سے اوصاف نقش لوح کا نکلے
جو مدح و منقبت حضرت کی ورد جاں میرے ہو - دمادم ہر نفس تو دل کا میرے حوصلا نکلے
جو نام پاک ورد جاں کا ہو بے فراموشی - تو کیونکر گے کہ اب ایماں کا میرے مزا نکلے
جبھی ارماں دل میرے بر آویگا اس عالم میں - جو عشق نام پر تیرے میں اپنے کو بھلا نکلے
جو میرے مرغ جاں نکلے قفس چھوڑے تو ارماں ہے - کہ غوث اللہ غوث اللہ کا منہ سے ندا نکلے
اے غوث اللہ الاعظم مرغ جاں کا میرے جب نکلے - یہی ہے آرزو دل کہ بر شوق لقا نکلے
جو اک ساعت تیرے دیدار کا دولت میسر ہو - تو رمز قلب قوسین و دنیٰ ما زاغ کا نکلے
تو میرے ساتھی ہو جانا جو تیرے بیدل مقبول - تجسس میں تیرے ملک عدم ہی کو وہ جا نکلے

গযল

কলমের মুখে গাউসে পাকের নাম যবে বেরোল,
মহান খোদার তরফ থেকে মারহাবা ধ্বনি আসিল।

বহুলনা লিলেয়ে কা কফরজান হে - কফরজান কা জাঁ সা পনাঁ হে
য়া ইমাম হক য়া গউছ আল আম - হো নজর মকবুল পর তেরা নে কম

মসনবী

তোমারই স্মরণ অমৃত উত্তম, এ ছাড়া সব মরীচিকা বরণ।
পুষ্প বিনে বিধ্বস্ত পুষ্পোদ্যান, গোলাব জলে খুঁজি তাই পুষ্প সুঘ্রাণ।
মজনু একদা বিজন মরু প্রান্তরে, লাইলীর বিরহে মগ্ন চিন্তা গভীরে।
বালি ছিল কাগজ আঙ্গুলই কলম, লিখতে ছিল শুধু লাইলীর নাম।
লোকে দেখে জিজ্ঞেসিল তারে, হে লাইলীর প্রেমের মরারে।
বালুচরে কী করছ অংকন, হিয়ার খুনে সদা লিখছ কী এমন?
বিচ্ছেদের খড়্গে কর্তিতজন কহে, লাইলীর বিরহে এ ঘটনা যে!
বহুকাল ধরে বিচ্ছেদে বধিত, লাইলীর বিরহে হৃদয় বিগলিত।
লাইলীর মিলন পন্থা না মিলে, বিরহে তার বিধ্বস্ত হলাম যে!
লাইলীর নাম লিখছি বসে তাই, হৃদে যদি টুকু শান্তি পাই!
ইউসুফের বিরহে ইয়াকুবের আঁখি, ফিরে সদা সে উদ্দেশিত খুঁজি!
যদিও ইউসুফের দর্শন না পাইল, তাঁর জামার খুশবোতে চোখ ভাল হল।
লাইলীর নাম আত্মার প্রাণের প্রাণ, লাইলীর স্মরণ আমার যে ঈমান।
লাইলীর স্মরণ বিচ্যুতি আত্মার অস্বীকৃতি, আত্মরূপ লুকায়িত আত্মার কুফরী।
হে ইমামে হক্ব গাউসুল উমাম, মকবুল পরে দয়া দৃষ্টি কর দান।

অতএব, নিজের ও বন্ধুদের মনে সান্ত্বনা দেওয়ার মানসে সংক্ষিপ্ত কয়টি কথা পত্রস্থ করছি। কেননা, প্রেমাস্পদের স্মরণ প্রেমিকের শান্তি স্বস্তির মূল নিয়ামক বরং আশেকদের ঈমানের মূল। **الابذكر الله تطمئن القلوب** 'খবরদার! আল্লাহ্‌র যিকির অন্তর সুস্থির করে দেয়' এ কথারই সুস্পষ্ট বর্ণনা। হাদীসের বাণী, **من احبّ شيئا اكثر ذكره** 'যে যাকে ভালবাসে অধিক হারে তাঁর স্মরণ করে' এ দাবীর উজ্জ্বল প্রমাণ। আরো উল্লেখ্য যে, এটি আল্লাহার দয়ানুগ্রহ ও অন্তহীন মঙ্গল প্রাচুর্য লাভের হেতুও বটে। **عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة** 'পূণ্যবানদের স্মরণের সময় রহমত বর্ষিত হয়' এ দাবীর বলিষ্ঠ সাক্ষী। তা ছাড়াও এ কাজে যতসব দৈন্য বাস্তবে তার সবটাই বালশাহী।

قطعہ

گفتم کہ چیست دولت گفتا گدائی یار - گفتم کہ چیست گدیہ گفتا ز گل بریدن
گفتم کہ چیست خوشتر از گفتگوے عالم - گفتا کہ از جوانب اوصاف او شنیدن

পংক্তি

জিজ্ঞাসিলাম দৌলত কী? বলা হলো বন্ধুর সেবা
বললাম সেবা কী? বললো সবকিছু পরিহার।

হযরতের নাম উচ্চারিতে তুরের ঝলক বের হল,
প্রশংসাকারীর চোখে সদা সুরমা যে ভাসিল।
লেখনীর মৃদুশব্দ শুনে ফিরিশ্‌তারা সকলে,
মস্ততায় নেচে নেচে কলম চুমিতে যে আসিল।
দূর-দূরান্তে যত আছে আদবে করে মাথা নত,
গাউসে খোদার গুণ কভু সমাবেশে যদি বর্ণনা হইল।
যে স্থানে গাউসে খোদার পুতালোচনা হয়,
আল্লাহর রহমতের ধারা সদা অবশ্য সেথা বইতে লাগিল।
ফরিয়াদ কবুল হয় সেথা হযরতের যিকর হয় যেথা
যার মনে যে প্রার্থনা স্মরণ মুহূর্তে দিলে আসিল।
হযরতের মাহফিলে সদা ফিরিশ্‌তারা হয় যে গোলাপদান,
সুগন্ধ নির্মাতার মাহফিলে বেহেশ্‌তী খুশবো ছড়াতে লাগিল।
নবীজির প্রিয় সে আয়োজন হয় যেথা হযরতের স্মরণ,
বেহেস্তের উদ্যান মুখে ইর্ষাবাক্য যে আসিল।
বেহেস্তি বৃক্ষের কলম আমার কালি কস্তুরী-আম্বর
কলম-নির্গত গুণাবলীতে লওহে মাহফুজের নক্সা আসিল।
যে অবধি হযরতের গুণগান মম দিলের জপ হল,
সে হতে হৃদয়ের প্রতিশ্বাসে হিয়ার খুন বেরিয়ে যে আসিল।
পাক নামের জপমালা হৃদয়ে সদা জাগরূক থাকলে
বুঝি তবে আমার এবে ঈমানের স্বাদ যে আসিল।
মনস্কাম আমার পূর্ণ হবে এ জগতের মাঝে তবে
যদি তব প্রেমে হয়ে বিভোর আমিত্ব আমার শেষ হইল।
আমার প্রাণপাখী পিঞ্জর ছেড়ে, উড়ে যেতে এ বাসনা
গাউসুল্লাহ গাউসুল্লাহ জপনা, রসনায় সদা জারী থাকিল।
হে গাউসুল্লাহিল আ'যম, আমার প্রাণপাখী উড়িবে যবে
দিলে শুধু এই গো আশা, মিলনাকর্ষণ যেন হৃদয়ে রইল।
বণিকের দর্শন তোমার, যদি পেয়ে ধন্য হই
নৈকট্যেও চূড়ান্ত রহস্য, তবে বাস্তবায়িত যে হইল।
বেদিল মকবুলের তব সঙ্গে থাকিও সর্বক্ষণ,
তোমারই অন্বেষণে সেই, বিলীন পথে বেরিয়ে আসিল।

যদিও এ মূল্যহীন অণুর পক্ষে ঐ জগত উজ্জ্বলকারী সূর্যের বর্ণনা দেওয়ার কোন শক্তি নেই, অন্তহীন সমুদ্রের তল অনুসন্ধানে বুদ্বুদ সম্পূর্ণ রূপে অক্ষম, অধিকন্তু শক্তিহীন অণুর সামর্থ মূলতঃ সূর্যরশ্মিরই শক্তি, বুদ্বুদের নড়া-চড়া ও স্থিরতা প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের বিক্ষুব্ধতা ও শীতলতার উপর স্থিত। এ বুদ্ধিহত ও জ্ঞানহীন এ বিষয়ে **اوتیت جوامع الکلم** 'আমি বাক্যসমষ্টি প্রদত্ত' ভাণ্ডার থেকে যা কিছু এ দুর্বল চিত্তে অবতারিত হয়েছে তাই লিপিবদ্ধ করেছি। এবং যা কিছু **وما ینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی** 'এবং তিনি প্রবৃত্তি থেকে কিছুই বলেন তাতো নয় কিন্তু শুধু ওহীই' এর খনির উত্তরসূরীর দানের ফোয়ারা থেকে অধীনের হৃদয়ে উদ্ভাসিত তাই চিত্রায়িত করেছি। যেহেতু এ লিখনীর বেলায় আপাদমস্তক ত্রুটিযুক্ত অস্তিত্বহীনের অস্তিত্ব বাঁশরীবৎ সেহেতু কোন সংকীর্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন নিজের বোধ-বুদ্ধির ত্রুটি হেতু যদি আমার সমালোচনা করে তবে **ما علی الرسول الا البلاغ** 'রাসূলের উপর শুধু প্রচারের দায়িত্বই বর্তায়' মর্মে সে ঐ বিশুদ্ধজ্ঞান রহস্য সাগরের সমালোচক বলে বিবেচিত হবে।

اگر ذرہ کہیں پرتو فشاں ہے - تو وہ خورشید تاباں سے عیاں ہے
وہ جنبش بلبلا کا بحر سے ہے - کہ بن دریا کے وہ ممکن کہاں ہے
دم نائی سے ہے وہ نغمہ نی - بظاہر نغمہ نی جانکشاں ہے
ہے جنبش جسم کا وہ جنبش جاں - بظاہر جسم سے جنبش عیاں ہے
وہی لیتا ہے دلدادوں سے دل کو - اگرچہ مجسم بس دلبران ہے
بہانہ غیر میں خود کام کرنا - حقیقت میں صنم کی یہ نشاں ہے
دکھو قرآن کی تفسیر وکلوتم کہول - وما ینطق کی آیت میں بیاں ہے
حسینان جہاں میں ایک معنی - ورائے طور انسانی نہاں ہے
یہ معنی کو وہ سمجھے صید جان سے - جو تیر چشم وابرو شاہداں ہے
حدیث قدسی الانسان سری - انا سرہ بس اس کا بیاں ہے
قلم غماز ہی مقبول لے تہام - کہ دکھتا ہوں قلم کو دو زباں ہے

কবিতা

অণু যদি কোথাও রশ্মি ছটায়, তবে তা সূর্যের বদান্যতায় প্রকাশ পায়।
বুদ্বুদের নড়া-চড়া সমুদ্র পরে স্থিত, সাগর বিনে অকল্পনীয় তার অস্তিত্ব।
বাঁশী ওয়ালার ফুৎকারে বাঁশীর সুর মূর্ছনা, প্রকাশ্যে বাঁশীর সুর চিত্তকার্ষক কভইনা?
শরীরের নড়া-চড়া আত্মার উপর স্থিত, যদিও প্রকাশ্যে শরীর থেকে প্রকাশিত।
তিনিই প্রেমিকদের দিল করেন হরণ, যদিও প্রেমাস্পদগণ হন অভিযুক্ত।
অন্যের বাহানায় নিজে করেন কর্ম, অধরা প্রেমাস্পদের এ নীতি ধর্ম।
কুরআনের তাফসীর খুলে দেখনা, 'বলেন না নিজে' আয়াতে বর্ণনা।
জগতের সব সুন্দরের মূলে একজনা, মানবাকারে প্রতিবিম্বিত দেখনা।
এ মর্ম বুঝবে কেবল শিকার প্রাণে, বধ হয়েছে যে সে নয়ন বাণে।
মানব আমার রহস্য আমি মানবের, হাদীসে কুদসী মর্মে ঘোষণা খোদার।
কলম গুপ্তচর, মকবুল কষে ধর লাগাম, কলমেরও দেখি দু'টি যবান।

যেহেতু এ পবিত্র বাক্যাবলী প্রকৃতপক্ষে মেশকাতে গাউসিয়া বা ত্রাণকর্তৃত্বের দীপদানের পরতও বা নূরের ছটা সেহেতু আঙ্গিনায়ে বারী ফি তরজুমাতে গাউসিল্লাহিল আ'যম

মাইজভাণ্ডারী বা গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর জীবন চরিতে প্রভুর দর্পণ নাম করণ করে এক لمعہ বা চমক, দু'টি جلوہ বা দীপ্তি ও একটি پارقہ বা ঝলকে বিন্যস্ত করলাম। আল্লাহ এ পুস্তককে আমাদের সকলের জন্য উপকারী এবং নিরেট তাঁর সম্মানিত সত্তার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে বলে পরিগণিত করুন। নিশ্চয় তিনি দানশীল, একচ্ছত্র কর্তৃত্ব সম্পন্ন, সদয়, দয়াময় ও দয়ালু।

وها انا اشرع فی المقصود ـ انه هو ذو الفضل الوجود

دمنه التوفیق والاعانة فی البدایة ـ والیه المرجع والماب فی النهایة

পংক্তি

গন্তব্যের পথে যাত্রা করলাম শুরু, নিশ্চয় দয়ানুগ্রহের মালিক সে প্রভু।
তার সাহায্য ও সামর্থ চাই শুরুতে, সকলের প্রত্যাবর্তন সবশেষে তার দিকেতে।

لمعہ বা চমক, ভূমিকা প্রসঙ্গে; এতে সাতটি پرتو বা রশ্মি রয়েছে।

প্রথম পরতৌ বা রশ্মি: বেলায়তের সংজ্ঞা, প্রকার ও আউলিয়া কিরামের পদমর্যাদা সম্পর্কীয় আলোচনা। আলোকিত অন্তর, প্রভু পরিচয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞাতা, প্রভুরহস্য জ্ঞানসম্পন্ন জ্ঞানীগণের নিকট সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা সকল দোষ ত্রুটি হতে পূতপবিত্র। তাঁর মহান দরবার ধ্যান-ধারণার নাগালের বাইরে। তাঁর রাজত্ব ও মহানত্ব পতনাঘাতের উর্ধ্বে। তাঁর কুদরত ও হিকমত সমালোচনার কলঙ্কমুক্ত। তাঁর প্রতিটি সিফাত বা গুণাবলী উপমার জন্য বৈধ। বহুত্বের মূল, তাঁর পবিত্র সত্তা পবিত্রতা ও একত্বের উপযুক্ত। কেমন প্রকৃত উপাস্য এবং নিঃশর্ত প্রজ্ঞাময় সত্তা যে, স্বর্ণখচিত তাঁবু সত্তাকাশকে স্তম্ভ ও খুঁটিবিহীন দাঁড় করিয়েছেন। ভূপৃষ্ঠের বিছানা পানির উপর স্থাপিত করে **موالید ثلث** বা তিন প্রকারের সৃষ্টি তথা জীব, জড় ও উদ্ভিদ দ্বারা সজ্জিত করেছেন।

وماخلقت الجن والانس الالیعبدون 'আমি জ্বীন ও ইনসান সৃষ্টি করিনি কিন্তু আমার ইবাদতের জন্য' মর্মে শুধুমাত্র মানব ও দানবকে স্বীয় পরিচয় ও উপাসনার জন্য নির্বাচন করে নিয়েছেন। বিশেষ করে মানব জাতিকে **ولقد کرمنا بنی ادم** 'এবং অবশ্যই আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি' মর্মে সম্মানের রাজমুকুট পরিধান করিয়েছেন। হৃদয়োত্তাপ ও সহৃদয়তার মর্যাদা দানে আদম সন্তানকে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিস্তাদের উপর দ্বিগুণ মর্যাদা দিয়েছেন।

مثنوی

قدسیوں کو عشق تھا اور درد کا حصہ نہ تھا ـ درد کی خاطر خدا نے آدمی پیدا کیا
ایک ذرہ عشق کل آفاق سے خوشتر سمجھ ـ ایک ذرہ درد کل عشاق سے بہتر سمجھ

মসনবী:

ফিরিস্তাদের প্রেম ছিল, ছিলনা বিরহের অনুভূতি,
দরদের কারণে খোদা সৃজন করলেন মানবজাতি।
এক বিন্দু প্রেম সমস্ত জগত থেকে উত্তম জান,
অণুসম দরদ সকল আশেকের চেয়ে শ্রেয় মান।

অতঃপর সৃষ্টির সেরা জীব মানবজাতির মাঝে দৃঢ়প্রত্যয়ী পয়গম্বর সৃজন করে জগতের পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব তাঁদের হাতে ন্যস্ত করেন। বিশ্বকুল সরদার, নবীকুল সম্রাট মানব-দানবের রাসূল আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা (দ.) কে সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল সাব্যস্ত করেন। তাঁর আলোময় বিকাশ ঈমানের অস্তিত্বের হেতু নিরূপন করেছেন। তাঁর দ্বীনকে সকল মিল্লাত ও দ্বীনের রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর বংশধরকে উত্তম বংশ, তাঁর সাহাবীকে উত্তম সাহাবীর উপাধিতে ভূষিত করে দ্বীনে মুহাম্মদীর ব্যবস্থাপনা তাঁদের যিম্মায় অর্পণ করেন। অতঃপর ওলামায়ে হক্কানী ও আউলিয়ায়ে রব্বানীগণকে সৃজন করেন। তাঁদের মাধ্যমে ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় ও ঈমানের ধারা শক্তিশালী করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকেই হেদায়ত আকাশের তপনতুল্য। তাঁরাই সঠিক পথের দিশারী এবং হেদায়ত বাগের মনমাতানো গন্ধে ভরা গোলাপ। তাঁদের চরণধূলির বরকতে ভূমন্ডল ও নভোমন্ডল প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের সুদক্ষ পরিচালনায় জগত পরিচালিত। প্রতি যুগে এক লক্ষ ছব্বিশ হাজার আউলিয়ায়ে কিরাম (রহ.) ধরাপৃষ্ঠে বিদ্যমান থাকেন। হযরত মাওলানা জামী (রহ.) **نفحات الانس** (নুফহাতুল উনছ) গ্রন্থে লিখেছেন, তন্মধ্যে চার হাজার জন **مکتوم** বা লুকায়িত। তাঁরা একে অপরকে চেনেন না; এমনকি নিজের হাল বা অবস্থার সৌন্দর্য সম্পর্কেও অজ্ঞাত। তাঁরা সর্বদা নিজ ও অন্যান্য সৃষ্টি থেকে গোপন থাকেন। হাদীসের বর্ণনা ও আউলিয়ায়ে কিরামের বাণী এ ক্ষেত্রে সাক্ষ্যবহ। জগতের সমস্যা সমাধানকারী, আল্লাহর দরবারের সামরিক ফৌজ, খোদার রাজত্ব পরিচালনা কার্যনির্বাহী তিনশত জন আউলিয়া রয়েছেন; তাঁদেরকে **اخیار** বা পূণ্যবান বলা হয়। আরো চল্লিশ জন রয়েছেন, তাঁদেরকে **ابدال** বা বিকল্প, স্থলাভিষিক্ত ইত্যাদি বলা হয়। এছাড়া আরো সাতজন রয়েছেন, তাঁদেরকে **ابرار** বা ন্যায়পরায়ণ বলা হয়। আরো চার জন রয়েছেন,

তাঁদেরকে **اوتاد** বা খুঁটি বলা হয়। আরো তিন জন রয়েছেন, তাঁদেরকে **النقباء** বা খোদাভীরু বলা হয়। আরো একজন রয়েছেন, তাঁকে **قطب** বা কেন্দ্রবিন্দু ও **غوث** বা ত্রাণকর্তা বলা হয়। এ তিনশত ছাপ্পান্ন জনের প্রত্যেকে একে অপরকে চেনেন এবং জগতের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে একে অন্যের মুখাপেক্ষী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র হাদীস এ বিষয়ের সাব্যবাহী।

تاریخ فرشته ও **مغز المعانی** গ্রন্থদ্বয়ে উল্লিখিত আছে যে, আউলিয়ায়ে কিরাম (রহ.)'দের চারটি স্তর রয়েছে। যথা **صغری** বা ক্ষুদ্রতর, **کبری** বা বৃহত্তর, **وسطی** বা মাধ্যম ও **عظمیٰ** বা সর্ববৃহত্তর। তাঁদের প্রত্যেকের প্রারম্ভ, মধ্য ও প্রান্ত রয়েছে। এ স্তরসমূহে সমাসীন আউলিয়া কোন যুগে তিনশত ছাপ্পান্ন জনের কম হয়না। সম্মানিত সূফিগণ তাঁদের তিনশত জনকে **ابطال** বা বীর সাহসী, চল্লিশ জনকে **ابدال** বা স্থলাভিষিক্ত, সাতজনকে **سیّاح** বা ভ্রমণকারী, পাঁচজনকে **اوتاد** বা খুঁটি, তিনজনকে **قطب الاوتاد** বা খুঁটিদের মূল এবং একজনকে **قطب الاقطاب** বা মূলের মূল ও **غوث** বা ত্রাণকর্তা বলা হয়। তাঁদের একজন হ্রাস পেলে নিম্নস্তর থেকে একজনক তদস্থলে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে থেকে পাঁচ আওতাদ, তিন কুত্বুব ও একজন কুত্বুল আকতাব; এ নয়জন ছাড়া অন্য কেউ **ارشاد** বা আদেশ নিষেধের ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। জেনে রাখুন! **ولایت** [বেলায়ত] ওয়া বর্ণে যেরযোগে দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ বেলায়তে ঈমান; এটাকে বেলায়তে আম্মাহ বা সাধারণ বেলায়ত বলা হয়। এতে সাধারণ মুমিনগণ শামিল। আল্লাহর বাণী

الله ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور 'আল্লাহ ঈমানদারগণের বন্ধু বা অভিভাবক, তাঁদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন' এদিকেই ইঙ্গিতবহ। দ্বিতীয়তঃ বেলায়তে ইহ্সান, এটাকে বেলায়তে খাস্সাহ বা বিশেষ বেলায়তও বলা হয়। বিশেষ, বিশেষ অতিবিশেষ ও আল্লাহর মিলন লাভকারী ব্যক্তিবর্গ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বেলায়তে খাস্সাহঃ বান্দা আল্লাহর মাঝে বিলীন হয়ে আল্লাহর সাথে অলীনতা অর্জনকে বুঝায়। ফানা বা বিলীনতা হচ্ছে, **سیرا الی الله** বা আল্লাহর দিকে গমণের শেষপ্রান্ত। বকা বা অলীনতা হচ্ছে, **سیر فی الله** বা আল্লাহর মাঝে পরিভ্রমণের প্রারম্ভ। কেননা, **سیرا الی الله** বা আল্লাহর দিকে ভ্রমণ তখনই পরিপূর্ণ হয়, যখন আমিত্ব ও অস্তিত্বের বিস্তৃত ময়দান সিদ্ক বা সততা ও ইখলাস বা আন্তরিকতার দৃঢ়পদে অতিক্রম করা হয়। এটি **فناء ثلث** বা ত্রিবিধ বিনাশ তথা **خلق** বা সৃষ্টি **هویٰ** বা প্রবৃত্তি ও **ارادہ** বা কামনা-বাসনা ছাড়া অকল্পনীয়। অতএব, ত্রিবিধ বিনাশের বর্ণনা সামনে আসবে। **سیرا الی الله** বা আল্লাহর মাঝে পরিভ্রমণ তখনই বিশুদ্ধ হয় যে, পরিপূর্ণ বিলীনতার পর অপবিত্রতার ত্রুটিমুক্ত পূতপবিত্র সত্তা ও বিশুদ্ধ একক অস্তিত্ব খোদা পথযাত্রী লাভ করবে। যার মাধ্যমে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত ও আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার স্তরে উন্নতি সাধিত হয়। এ বিশেষ বেলায়তকে সাধারণ মুমিনদের সংশ্লিষ্টতায় **ولایة صغریٰ** বা ক্ষুদ্রতর বেলায়ত, নবীগণের সত্তার সাথে সম্পর্ক বিবেচনায় **ولایة عظمیٰ** বা সর্ববৃহত্তর বেলায়ত এবং ফিরিস্তাদের সম্পৃক্ততায় **ولایة علیا** বা উচ্চতর বেলায়ত বলে অভিহিত করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, **ولی** শব্দটি **فعیل** এর গঠনে **فاعل بصفة مبالغه** বা অত্যধিক গুণসম্পন্ন অর্থে কর্তৃবাচ্য ও **مفعول** বা কর্মবাচ্য অর্থেও আসে। প্রথমাবস্থায় ওলী অর্থ অধিক নৈকট্য লাভকারী ও নৈকট্যের অধিকারী। যেমন, আল্লাহর বাণী: **ربّ زدنی علماً** 'হে আমার প্রভু! আমাকে অধিক জ্ঞান দান করুন' এ দিকেই ইঙ্গিতবহ। এটি **کاملین** বা পরিপূর্ণদের অবস্থার বিবরণ। দ্বিতীয় তথা কর্মবাচ্য অর্থে ওলী মানে নিকটে আনয়নকৃত ও নৈকট্যপ্রাপ্ত। আল্লাহর ঘোষণা: **وهو یتولی الصّالحین** 'এবং তিনি পুণ্যবানদের সাথে বন্ধুত্ব করেন' এ দিকেই ইঙ্গিতবহ। অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই পুণ্যবান বান্দাদের পছন্দকারী, অভিভাবক ও যিম্মাদার। একটি মাত্র মুহূর্ত ও ক্ষণের জন্যও তাঁদেরকে নিজের প্রবৃত্তির কাছে সোপর্দ করেন না। এটি পূর্ণতা লাভ ও দানকারীর বৈশিষ্ট্য। উক্ত উভয় প্রকারের বৈশিষ্ট্য ওলীর মাঝে থাকা আবশ্যক। সুতরাং একজন ওলী **ولایة** ওয়া বর্ণে যের ও যবর উভয়রূপ বেলায়তের অধিকারী হন। যেরযোগে বেলায়তের সংজ্ঞাতো বিবৃত হল; যবর যোগে 'অলায়ত' হচ্ছে ঐ পূর্ণতা লাভ ও দানকারী ওলী যিনি আপন মুরিদকে ত্বরিক্বতের শিক্ষা-দীক্ষাদান ও খোদা পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম। সারকথা হচ্ছে, ওলী সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ককে ওয়া বর্ণে যবর যোগে **ولایة** 'অলায়ত' বলা হয়। আর ওলী ও আল্লাহর মধ্যকার বিদ্যমান সম্পর্ককে ওয়া বর্ণে যের যোগে বেলায়ত বলা হয়। ওলী এ নশ্বর জগত থেকে বিদায়ের বেলায় বেলায়ত সঙ্গে নিয়ে যান, আর অলায়ত অন্য কারো হাতে সোপর্দ করে দেন। আল্লামা জামী (রহ.) নুফহাতুল উন্স গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।

(চলবে)-

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে 'ইবাদাত'

● ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ ছিদ্দিকী ●

'ইবাদাত শব্দটি আমাদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। মুসলমানদের সম্যকভাবে অবগত থাকা আবশ্যক যে, ইবাদাত বা গোলামী এক, অদ্বিতীয় ও লা-শরীক আল্লাহর জন্যই এককভাবে নির্দিষ্ট। 'ইবাদাত আর কারো জন্যে প্রযোজ্য নয়, হতেও পারে না। এটাই হচ্ছে যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণের আনিত ও প্রদর্শিত দ্বীন। আর দ্বীন হচ্ছে শরীয়াত। আর শরীয়াতের দাবী হল ইবাদাত। প্রত্যেক নবী রাসূলগণের ঘোষণা ছিল- কুর'আনের ভাষ্যমতে- হে জাতি! তোমরা এক আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য কারো দাসত্ব করো না। এই মহাসৃষ্টির স্রষ্টা হলেন আল্লাহতা'আলা। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সবকিছু লালন ও প্রতিপালন করেন। আর এতে তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর আদিও নেই, অন্তও নেই। যখন কোন কিছু ছিল না, তখন তিনিই ছিলেন। যখন কোন কিছু থাকবে না, তখনও তিনিই থাকবেন। তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। কোন কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে তিনি শুধু বলেন 'হও' ততক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। এ ভাবেই তিনি এ মহাসৃষ্টির সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুর অস্তিত্ব দান করেছেন। সে জন্য তাঁরই 'ইবাদাত করা অপরিহার্য। তাই এ প্রবন্ধে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে 'ইবাদাতের পরিচিতি ও বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হল।

'ইবাদাতের পরিচয়: **عبادة** শব্দটি **فعالة** এর ওজনে বাবে **نصر** এর ক্রিয়ামূল। **عبادة** এক বচন। বহু বচনে **عبادات** যা আরবী **عبد** (আব্দ) ধাতু থেকে নির্গত। আবদ শব্দটি স্বাধীন এর বিপরীত দাস বা পরাধীন অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১] এর অর্থ- বন্দেগী, উপাসনা, পূজা, দাসত্ব, সেবা। তবে **ابن كثير** এর মতে **عبادت** শব্দটি **الذلة** ধাতু থেকে নির্গত। যার অর্থ- নীচতা, বশ্যতা।[২]

কুরআনের পরিভাষা গ্রন্থের ভাষ্য মতে- আনুগত্য, দাসত্ব, বাধ্যতা ইত্যাদি ইবাদাতের আভিধানিক অর্থ। আনুগত্য, বশ্যতা স্বীকার, কার্যোপযোগীকরণ অর্থেও ইবাদাত ব্যবহৃত হয়। যেমন- **عبد الطريق** (রাস্তাটিকে যাতায়াতের উপযোগী করা হয়েছে)। **عبدت بنى اسرائيل** (আপনি বনু ইসরাঈলকে বশ করে দিয়েছেন।)[৩]

مذكرة فى العقيدة গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

معنى العبادة لغة هو الذلل والخضوع والانقياد অর্থাৎ বশ্যতা, বিনীত হওয়া ও আনুগত্য করা।[৪]

ইসলামী বিশ্বকোষ গ্রন্থে শব্দটির তিনটি অর্থের বর্ণনা আছে। যথা:

(ক) আরাধনা, উপাসনা, যেমন- লিসানুল 'আরব এ আছে- (**عبد الله عبادة تأله له**) সে 'ইবাদত করিয়াছে, ইহার অর্থ সে একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদত করিয়াছে।

(খ) নিজের চরম অসহায়ত্ব ও কাকুতি-মিনতির প্রকাশ (**العبادغاية التذلل**)।

(গ) অনুগত (**العبادة الطاعة**)।[৫]

'উবুদিয়াত : মানুষ আল্লাহ তা'আলার 'আব্দ বা দাস। দাস হিসেবে প্রভুর সব হুকুম তার তামিল করা উচিত। আল্লাহ তা'আলার হুকুম তামিল করা হল 'উবুদিয়াত বা দাসের সংগত আচরণ। 'ইবাদাতের চেয়ে 'উবুদিয়াত শব্দের অর্থ ব্যাপকতর। 'উবুদিয়াতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন-

১. এটি আল্লাহ ও সৃষ্টির মধ্যকার একটি চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি। এ চুক্তি অনুযায়ী পৃথিবীর তাবৎ সম্পদ মানুষ ভোগ করবে এবং আল্লাহতা'আলাকে মানবে ও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে।

২. এ চুক্তির আরো অনেক শর্ত আছে। সেই সব শর্তাধীনে নিয়ন্ত্রিত হয় দুনিয়ার সমুদয় সৃষ্ট জীবের আচরণ। অন্যের অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। আমানতের মর্যাদা রক্ষা করবে। সত্য কথা বলবে ইত্যাদি।

৩. তারা প্রতিপালক প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবে। নিয়ত তাদের আত্মার আকুতিকে বোঝার চেষ্টা করবে, কারণ সেটি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছারই প্রতিফলন। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ যদি উপলব্ধি করতে তারা সক্ষম হয়, তাহলে তারা আল্লাহ তা'আলাকে বুঝতে পারবে। আত্মাকে তারা যদি দর্পণের মত স্বচ্ছ রাখতে পারে তাহলেই সকল খোদায়ী ইচ্ছার তাতে প্রতিফলন ঘটবে।[৬]

পারিভাষিক অর্থঃ ১. মাওলানা মুফতী শফি (র.) বলেন- কারো প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দরুণ তাঁর নিকট নিজের আন্তরিক কাকুতি- মিনতি প্রকাশ করার নাম 'ইবাদাত।[৭]

২. **تيسير الكريم الرحمن** গ্রন্থের ভাষ্য মতে-

أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والأقوال الظاهرة والباطنة

অর্থাৎ 'ইবাদাত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এতে ঐসব বাহ্যিক এবং গোপন কথা ও কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা আল্লাহর পছন্দনীয় এবং যা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম।[৮]

৩. **المعجم الوسيط** এর উদ্ধৃতি মতে-

أن العبادة هو الخضوع للاله على وجه التعظيم তথা শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভক্তি সহকারে আল্লাহর প্রতি বিনীত, অনুগত ও বাধ্য হওয়াকে ইবাদাত বলে।[৯]

৪. আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন-

العبادة اقصى غاية الخضوع والتذلل ولذالك لم تستعمل الا فى الخضوع لله تعالى (الكشاف) (১/১১)

অর্থাৎ অতিশয় নম্রতা ও বিনয় প্রকাশের নাম ইবাদাত। এ জন্য ইবাদাত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য প্রযোজ্য নয়।[১০]

৫. আল্লামা মুহাম্মদ বিন্ আবদুল ওয়াহাব বলেন-

العبادة اسم يجمع عمال الحب لله ونهياته وعمال الذل لله نهايته

অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে চরম বিনয় ও তাঁর জন্যে পরিপূর্ণ ভালবাসা এ উভয়ের সমষ্টির নাম হল 'ইবাদাত।[১১]

৬. ইসলামী বিশ্বকোষের উদ্ধৃতি মতে-ইবাদাতের অর্থ মহান আল্লাহর নির্ধারিত পন্থায় তাঁহার উপাসনা করা, তাঁহার নিকট বিনয় প্রকাশ করা এবং তাঁহার নির্দেশের আনুগত্য করা। ইমাম রাজীর (র.) মতে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁহার সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া, অনুগ্রহ ও সহানুভূতি পোষণ করাই ইবাদত।[১২]

৭. 'ইবাদাত শব্দটি কুরআনে আনুগত্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা- আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ألم أعهد إليكم يابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان انه له عدو مبين

অর্থাৎ হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের আনুগত্য করো না সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?[১৩]

تيسير الكريم الرحمن এর প্রণেতা لاتعبدوا الشيطان এর ব্যাখ্যায় বলেছেন لاتطيعوا الشيطان (শয়তানের আনুগত্য করো না)[১৪]। প্রকৃতপক্ষে শয়তানের আনুগত্য করা। উহার নির্দেশ মানিয়া চলা ও উহার তাবেদারী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ফলে আনুগত্য ও ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন-

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার দায়িত্বশীল লোকদেরও।[১৫]

৮. সূফি দর্শনে 'ইবাদাত অর্থ আল্লাহর নির্ধারিত সীমা সমূহের সংরক্ষণ করা, তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করা, শিরক থেকে মুক্ত থাকা এবং স্বীয় বিষয়াদিতে নির্লিপ্ত হয়ে সত্য দর্শনে বিলীন হয়ে যাওয়া।[১৬]

৯. দোয়া কি ইবাদাত? এর জবাবে تفسير العشر الأخير প্রণেতা বলেন- দোয়াই হল ইবাদাতের মূল। তিনি নিম্নোক্ত হাদিসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة (رواه احمد وابوداؤد والترمذى)

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হুজুর (দ:) এরশাদ করেন- দোয়াই ইবাদাতের সার।[১৭]

এ সম্পর্কে নো'মান বিন বশীর থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (দ:) এরশাদ করেন-

الدعاء هو العبادة' ثم قرأ ادعونى استجب لكم (ابوداؤد والنسائى)

অর্থাৎ দোয়াই ইবাদাত। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়লেন তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।[১৮]

সুতরাং দোয়া যে ইবাদাত তাতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব, ইবাদাত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সাধারণ মানুষ যা ধারণা করেন অর্থাৎ কতিপয় নির্ধারিত অনুষ্ঠানমালা যথা শুধুমাত্র নামাজ, রুকু, সিজদাহ, জিকর ও তাসবীহ এর নামই ইবাদাত, যা সঠিক নয়। বরং ইবাদাত হল মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধন তথা ইহকালিন শান্তি ও পরকালিন মুক্তির লক্ষ্যে কুরআন-সুন্নাহর বিধি মোতাবেক যেই কাজ করা হোক না কেন তারই নাম।

এক কথায় সমস্ত গোলামী, ইবাদাত বন্দেগী, দাসত্ব তাঁর জন্যই খাস। অন্য কোন মানুষের জন্য নয় এবং হওয়াও অসম্ভব। যদি কোন কর্মকান্ডে হয়েও থাকে নিজে তা উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ তা শিরক, তাওবাবিহীন যে শিরক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না। যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে, তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।[১৯]

'ইবাদাতের প্রকারভেদ ঃ ইমাম রাগিব আল্ ইস্পাহানী (র.)বলেন- 'ইবাদাত দুই প্রকার।[২০] যথা-

(ক) বাধ্যতামূলক ইবাদাত এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

ولله يسجد من فى السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال

.অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে সেজদাহ করে যা কিছু নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিচ্ছায়াও সকাল-সন্ধ্যায়।[২১]

(খ) ইচ্ছামূলক ইবাদাত- এটা বিবেক ও বাকশক্তি সম্পন্ন জীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তারা এ ইবাদাত করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত। যেমন আল্লাহ বলেন-

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون

অর্থাৎ হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর। যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা খোদাভীতি অর্জন করতে পারবে।[২২]

মোহাদ্দিছীনেকেরাম ইবাদাতকে দুই ভাগে ভাগ করেন।[২৩] যথা:

(ক) عبادة مقصودة এ ইবাদাতে নিয়্যত শর্ত। যেমন- নামাজ, রোজা যাতে নিয়্যত শর্ত।

(খ) عبادة غير مقصودة এ 'ইবাদাতে নিয়্যত শর্ত নয়। যেমন- অজু, গোসল, সতরে আওরত যাতে নিয়্যত শর্ত নয়। তবে সাওয়াবের জন্য নিয়্যত শর্ত।

এতে প্রথম প্রকার ইবাদাত ছাড়া সরাসরি আল্লাহর আনুগত্য পালন ও সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় প্রকার ইবাদাত দ্বারা সরাসরি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আনুগত্য পালন উদ্দেশ্য নয়, তা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মাধ্যম হয়ে থাকলে, তাকেও ইবাদাত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সুতরাং প্রত্যেক ইবাদাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য نيت শর্ত।

ফোকাহায়ে কেরামগণ ইবাদাতকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন।[২৪] যথা:

(ক) عبادة بدنية محضة : এমন ইবাদাত যা মানব দেহের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন- নামায, রোজা, যিকর, তিলাওয়াত, দোয়া ইত্যাদি।

(খ) عبادة مالية محضة : এমন ইবাদাত যা ধন-সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন- যাকাত, ফিৎরা, কুরবানী ও সাদাকাত ইত্যাদি।

(গ) عبادة مترددة بينهما : এমন ইবাদাত যা শরীর ও সম্পদ উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন- হজ্ব, জিহাদ ইত্যাদি।

আলোচ্য 'ক' প্রকারে যেমন 'নামায' তাতে ধন-সম্পদের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। তাই একে ইবাদাতে বদনী বলে। 'খ' প্রকারে যেমন 'যাকাত' তাতে শুধু ধন-সম্পদের সাথে সম্পর্ক, মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই, তাই একে ইবাদাতে মালী বলে। 'গ' প্রকারে যেমন 'হজ্ব' মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ধন-সম্পদ উভয়েই এক সাথে প্রয়োজন, তাই একে ইবাদাতে বদনী ও মালী বলে। মোট কথা শারীরিকভাবে হোক কিংবা আর্থিকভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন শ্রম বা অর্থ ব্যয় করে থাকলে তা 'ইবাদাত' হিসেবে গণ্য হবে।

الدكتور وهبة الزحيلى তিনি 'ইবাদাতকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন।[২৫] যথা: (ক) সালাত (খ) যাকাত (গ) রোজা (ঘ) হজ্ব (ঙ) জিহাদ।

(ক) সালাত : সালাত আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ দোয়া করা। ক্ষমা প্রার্থনা করা, দয়া করা, দরূদ পাঠ করা ইত্যাদি। পারিভাষায়- আল্লাহ পাকের নির্দেশিত বিশেষ এক ইবাদাত, যা রাসূল কর্তৃক প্রদর্শিত বিধি বিধান মোতাবেক রুকু-সিজদাহ সহকারে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করা হয়।[২৬]

নামাজ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

অর্থাৎ তোমরা নামাজ কায়েম কর। যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।[২৭]

হুজুর (সা:) বলেন- اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد বান্দাহ সিজদারত অবস্থায় তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়।[২৮]

(খ) যাকাত : যাকাতের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, পরিবৃদ্ধি, কোন জিনিসের উত্তম অংশ। المعجم الوسيط গ্রন্থকার বলেন[২৯]-মালের অংশকে যাকাত বলে। পরিভাষায়- আল্লামা ইউসুফ কারজাভী বলেন- [৩০] যাকাত শব্দটি মানুষের ধন-সম্পদে আল্লাহ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ও ফরযকৃত অংশ বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যাকাত পাবার যোগ্য লোকদের ফরজকৃত নির্দিষ্ট অংশের ধন-সম্পদ প্রদান করাকেও যাকাত বলে। (ইসলামে যাকাত বিধান) ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন:[৩১] সাদকাহ্ প্রদানের ফলে দানকারীর মন ও আত্মা পবিত্র হয়, তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়, পরিচ্ছন্ন হয় এবং প্রকৃতপক্ষে পরিমাণে তা বর্ধিত হয়। ক্রমবৃদ্ধি ও পবিত্রতা কেবল ধন-সম্পদের মধ্যেই সাধিত হয় না, যাকাত দানকারীর মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত তা সংক্রমিত হয়। সম্ভবত: এ দিকেই লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন[৩২] تطهرهم وتزكيهم بها خذ من أموالهم صدقة অর্থাৎ আপনি তাদের সম্পদ হতে 'সাদকাহ' (যাকাত) গ্রহণ করুন, যা দ্বারা তাদেরকে পবিত্র এবং পরিশোধিত করবেন।

আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী বলেন- যাকাত হচ্ছে ধনীর নিকট হতে গৃহীত দরিদ্রকে প্রদত্ত অর্থ।

আল্লাহ পাক বলেন[৩৩]

وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة

অর্থাৎ আর তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করতে এবং নামায কায়েম করতে।

হযরত ঈসা (আ:) দোলনায় থাকা অবস্থায় বলেছিলেন,[৩৪] واوصانى بالصلوة والزكوة ما دمت حيا অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন ততদিন নামাজ ও যাকাত আদায় করতে, যতদিন আমি জীবিত থাকি।

এক কথায়- যাকাত ইসলামী শরীয়াতের এমন একটি বিধান, যা নিসাব (সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য কিংবা তৎপরিমাণ টাকার মালের উপর এক বছর পূর্ণ হওয়া ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে শরীয়াত নির্ধারিত ব্যক্তিদেরকে শরীয়ত সম্মত পন্থায় কিছু সম্পদ (চলিশ ভাগের এক ভাগ) প্রদান করা।

(গ) সাওম বা রোযা : 'সাওম' আরবী শব্দ। ফার্সী ভাষায় রোজা বলে। صوم এক বচন। বহু বচনে صيام। এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরীয়াতের পরিভাষায়- রোযার নিয়তে সুবহি সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলে।

يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ। তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমন করে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।[৩৫]

অন্যত্র বলেন- فمن شهد منكم الشهر فليصمه অর্থাৎ তোমাদের যে এ মাসটি পায় সে যেন অবশ্যই তাতে রোযা পালন করে।[৩৬] উল্লেখ্য যে, অত্র মাসে এমন একটি রাত্রি রয়েছে, যে রাত্রিতে ইবাদাত করা হাজার বছর ইবাদাত করা অপেক্ষা উত্তম। যেমন- আল্লাহ বলেন - ليلة القدر خير من الف شهر অর্থাৎ লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। ইহা শারীরিক ইবাদাত। ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম রোকন। একে অস্বীকারকারী কাফির।[৩৭]

(ঘ) হজ্ব ঃ হজ্ব আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা, উপস্থিত হওয়া, মনোনিবেশ করা ইত্যাদি।

পরিভাষায়- নির্দিষ্ট মাসে নির্দিষ্ট নিয়মে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর তওয়াফ, যিয়ারত, উকুফ, কুরবানী ইত্যাদি আরকান আহকাম পালন করা।[৩৮] অন্যভাবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত তারিখ ও নিয়মে কা'বা শরীফ ও সংশ্লিষ্ট স্থান সমূহ যিয়ারত করাকে হজ্ব বলে।[৩৯] এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন-

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পবিত্র কা'বা গৃহে যাতায়াতের জন্য (দৈহিক ও আর্থিকভাবে) সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির উপর হজ্ব আদায় করা ফরজ।[৪০]

অন্যত্র বলেন- أتموا الحج والعمرة لله অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্ব ও উমরা পূর্ণ কর[৪১]।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হজ্ব হচ্ছে পঞ্চম। এটা হচ্ছে আর্থিক ও দৈহিক ইবাদাত। এতে যেমন অর্থ ব্যয় হয়, তেমনি হয় দৈহিক পরিশ্রম। তাই দৈহিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জীবনে একবার হজ্ব করা ফরজ।

(ঙ) জিহাদ ঃ জিহাদ আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ চেষ্টা করা, লক্ষ ও উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত সাধ্যমত সাধনা করা, চূড়ান্ত শ্রম সাধনা করা, কোন বিষয়ে নিজেকে প্রাণপণে নিবেদিত করা ইত্যাদি।[৪২]

পরিভাষায়ঃ কাফিরদের মধ্যে যাদের সঙ্গে চুক্তি বা অঙ্গীকার নেই তাদের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলে।[৪৩]

অন্যভাবে- ইসলাম ধর্মকে চির প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সর্ব প্রকার প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে জান, মাল, জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি যথা সর্বস্ব উৎসর্গ করে সংগ্রাম করাকেই জিহাদ বলে।

আল্লাহ পাক বলেন - وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله অর্থাৎ তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত না ফেৎনা-ফাসাদ চিরতরে নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন এককভাবে মহান প্রভুর জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।[৪৪]

অন্যত্র বলেন - يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال অর্থাৎ হে নবী! আপনি বিশ্বাসীদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করুন।[৪৫]

অন্যত্র বলেন ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে সশস্ত্র যুদ্ধ করে অতঃপর সে নিহত হয় কিংবা বিজয়ী হয়- আমি অতি শীঘ্রই তাকে শ্রেষ্ঠতম পুরস্কারে পুরস্কৃত করব।[৪৬]

এক কথায়- ধর্মের মূল রীতি-নীতি ও হুকুম-আহকাম এমনকি বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালনের স্বাধীনতা রক্ষার্থে এবং অসহায় নর-নারী ও নিষ্পাপ কোমলমতি শিশুদেরকে জালেমের হাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ ভাবে সশস্ত্র যুদ্ধ করার যে ধর্মীয় নির্দেশ তাই জিহাদ। এ হচ্ছে আর্থিক ও শারীরিক ইবাদাত।

এ ছাড়াও الفقه الإسلامي وأدلته প্রণেতা, সত্যবাদিতা, আমানত রক্ষা করা, মাতা পিতার সাথে সৎ ব্যবহার, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজে বাধা প্রদান, জিহাদ, ইহসান, দোয়া, যিকর, কিরায়াত, ইখলাস, সবর, শোকর, ভরসা, রুজা ও ভীতি ইত্যাদিকে ইবাদাত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন[৪৭]।

৫. শেখ আব্দুল্লাহ বিন হামদ আলখারবুশ এর মতে -[৪৮] ইবাদাত মূল তিন প্রকার সহ সর্বমোট সতের প্রকার।

(১) ইসলাম (২) ঈমান (৩) ইহসান (৪) দোয়া (৫) খওফ (৬) রজা (৭) তাওয়াক্কুল (৮) রাগবাৎ (৯) রাহবাৎ (১০) খুশু (১১) খাশয়াত (১২) ইনাবাত (১৩) ইস্তে'আনাত (১৪) ইস্তে'আযা (১৫) ইস্তেগাসাহ (১৬) যবহ (১৭) নযর ইত্যাদি।

*** তথ্য নির্দেশ ঃ**

১. সম্পাদনা পরিষদ- ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খন্ড- ৪র্থ, প্রকাশকাল মে- ১৯৮৮ ইং, পৃঃনং- ৪৩৮।

২. ড. মুঃ ফজলুর রহমান- আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৯৯ ইং, পৃঃনং- ৩৮৫। ও

(مختصر تفسير ابن كثير) ইসমাঈল বিন কসীর সংক্ষিপ্ত কারক الصابوني محمد علي, دار القرآن الكريم বৈরুত, প্রকাশ ১৯৮১ ইং পৃঃ ২২)।

৩. ড. মু: মুস্তাফিজুর রহমান- কুরআনের পরিভাষা কমিয়াব প্রকাশন, ঢাকা, প্রকাশ- ডিসেম্বর- ১৯৯৮ ইং, পৃ:নং- ২০৪, সূত্র: সূরা শুআরা ২৬/২২।
৪. ড. ছালেহ বিন সা'দ আচ্ছুহাইমী- মযকুর ফিল আকিদাত, প্রকাশনা الطبعة الثالثة عشرة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة মুদ্রন সন: ১৪২০ হি:, পৃ:নং- ২৫
৫. সম্পাদনা পরিষদ- ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত।
৬. এ. জেড. এম. শামসুল আলম- শাহীন আখন্দ অনূদিত- তাবলীগ ও দাওয়াহ (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ' ২০০ ৪ খ্রি) পৃ.২৫০-২৬৫ ।
৭. মুফতী মো: শফী (রহ:), معارف القرآن , বাংলা সংস্করণ, অনুবাদক- মাও: মহিউদ্দীন খান, খাদেমুল- হারামাইন বাদশাহ্ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, পৃ:নং- ০৪।
৮. শেখ আবদুর রহমান বিন নাছির- تيسير الكريم الرحمن রেসালাহ্ পাবলিকেশন্স, লেবানন, প্রথম প্রকাশ- ২০০২ ইং, পৃ:নং- ৩৯।
৯. ইব্রাহীম মোস্তফা,المعجم الوسيط , ইসলামীয়া লাইব্রেরী, ইস্তাম্বুল লাইব্রেরী, পেশওয়ার, প্রথম খন্ড, পৃ:নং-১৯।
১০. আলামা মু: আলী আচ্ছা'বুনী, صفوة التفاسير ফারুকীয়া লাইব্রেরী, পেশাওয়ার, প্রথম খন্ড, পৃ:নং- ১৯।
১১. শায়খুল ইসলাম মু'বিন আবদুল ওয়াহাব, كتاب التوحيد মালিক ফয়সাল বিন আ: আজিজ আলে সাউদ, হিজরী ১৯৩৪, পৃ:নং- ১৫।
১২. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ:নং- ৪৩৮-৩৯।
১৩. আয়াত নং ৬০, সূরা ইয়াছিন, আল্ কোরআন।
১৪. শেখ আবদুর রহমান বিন নাছির, প্রাগুক্ত, পৃ:নং- ৬৯৮।
১৫. আয়াত নং ৫৯, সূরা আন্ নিসা, আল্ কোরআন।
১৬. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ:নং- ৪৩৯, সূরা- আল্ মিরকাত, ১ম খন্ড, পৃ: নং- ৬০।
১৭. الطبعة العاشرة احكام فهم المسلم- تفسير المشر الاخير من القرآن , সন-১৪২৫ হিজরী, ww.tafseer.info, পৃ:নং- ৮১, সূত্র- আবু দাউদ, তিরমীযি।
১৮. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ:নং- ৪৪২ ও আয়াত নং- ৫০, সূরা আল মুমিন, আল্ কোরআন।
১৯. আয়াত নং- ৪৮, সূরা আন্ নিসা, আল্ কোরআন।
২০. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ:নং- ৪৩৮।
২১. আয়াত নং- ১৫, সূরা রা'দ, আল্ কোরআন।
২২. আয়াত নং- ২১, সূরা বাক্বারা, আল্ কোরআন।
২৩. শেখ যায়নুদ্দীন নাজীম আল মিস্রী, الأشباه والنظائر নিয়্যাত অধ্যায়।
২৪. সম্পাদক মন্ডলী, الموسوعة الفقهية ২য় খন্ড, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ ইং, পৃ:নং- ২৫৬-২৬১।
২৫. الفقه الإسلامي وادلته- الدكتور هبة الزحيلي প্রথম খন্ড, প্রকাশ- দারুল ফিক্র, তৃতীয় সংস্করণ, সন- ১৯৮৯ ইং, পৃ:নং- ৮১।
২৬. মু: আবদুর রব মিয়া, ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ,বাংলাদেশ, নামাজ অধ্যায়, প্রকাশ- ২০০৪ ইং পৃঃনং- ৭১।
২৭. আয়াত নং- ৪৩, সূরা বাক্বারা, আল্ কোরআন।
২৮. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রকাশ ইন্ডিয়া, তারিখ বিহীন, অধ্যায় নামাজ।
২৯. ইব্রাহীম মোস্তফা,المعجم الوسيط, ইসলামীয়া লাইব্রেরী, ইস্তাম্বুল লাইব্রেরী, পেশওয়ার, প্রথম খন্ড, পৃ:নং- ১৯।
৩০. আলামা ইউছুফ কারযাভী-ইসলামে যাকাতের বিধান, সম্পাদক মন্ডলী কর্তৃক অনূদিত, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)
৩১. ইমাম ইবনে তাইমিয়া-আল 'উবুদিয়া, আবদুল মালেক অনুদিত (ঢাকা: দারুল আরাবিয়া বাংলাদেশ' ১৯৯০ইং), পৃ: ১৫।
৩২. ৯/১০৩, আল্ কুরআন।
৩৩. ৯৮/০৫, আল্ কুরআন।
৩৪. ১৯/৩১, আল্ কুরআন।
৩৫. ২/১৮৩, আল কুরআন।
৩৬. ২/১৮৫, আল কুরআন।
৩৭. সূরা কদর, আল কুরআন।
৩৮. ড.মু:মুস্তাফিজুর রহমান-কুরআনের পরিভাষা কমিয়াব প্রকাশন, ঢাকা, প্রকাশ-ডিসেম্বর-১৯৯৮ইং, পৃ. ১৩০
৩৯. মু: আবদুর রব মিয়া, ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, নামাজ অধ্যায়, প্রকাশ- ২০০৪ ইং পৃ. ১৬৫
৪০. ৩/৯৭, আল কুরআন।
৪১. ২/১৯৬, আল কুরআন।
৪২. ড. মুস্তাফিজুর রহমান- প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০ ও ড. ইব্রাহীম মাকদুর- প্রাগুক্ত।
৪৩. ড. ইব্রাহীম মাকদুর- প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।
৪৪. ৩৯/ সূরা আনফাল, আল কুরআন।
৪৫. ৬৫/ সূরা আনফাল, আল কুরআন।
৪৬. ৭৪/ আননিসা, আল কুরআন।
৪৭. الفقه الإسلامي وادلته- الدكتور هبة الزحيلي প্রথম খন্ড, প্রকাশ- দারুল ফিক্র, তৃতীয় সংস্করণ, সন- ১৯৮৯ ইং পৃ. ৮১-৮২।
৪৮. শেখ আবদুল্লাহ বিন হামদ আল খারবুশ- دليل المسلم المبتدى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -১ম প্রকাশ'১৪১৬ হি. পৃ.৩৮।

(চলবে)

আধ্যাত্মিক পথ ও পাথেয়

● অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী ●

বেলায়াত, সূফিতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা সম্বলিত ইতিহাস ভিত্তিক গ্রন্থ "ছিয়ারুল আউলিয়া" যা ১৩০২ ইংরেজী সন থেকে ১৩২০ ইংরেজী সন পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বিরচিত। কিতাবটি রচনার সূত্রপাত করেন-শায়খুশ শুয়ুখিল আলম, সুলতানুল মশায়েখ, মাহবুবে ইলাহী, হযরত খাজা নিজাম উদ্দীন আউলিয়া কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ। পরবর্তীতে তার পূর্ণাঙ্গতা প্রদান করেন তাঁরই মুরিদ পরিবারের সদস্য বিখ্যাত আধ্যাত্মিক মণীষী হযরত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ মুবারক মুহাম্মদ উলুব্বী আল কিরমানী (রহঃ) যিনি "আমীরে খুর্দ" নামে সমধিক পরিচিত। মূল ফার্সী ভাষায় রচিত এ অমূল্য গ্রন্থখানা অন্যান্য ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। এ গ্রন্থে মাহবুবে ইলাহী খাজা নিজাম উদ্দীন (কঃ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ, বিবৃতি ও মহামূল্যবান বাণী প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া চিশ্‌তিয়া পরিবারের অপরাপর মণীষীদের সম্পর্কে তথ্যাদিও সন্নিবেশিত হয়েছে। ৫৫০ পৃষ্ঠা কলেবরের উক্ত গ্রন্থ থেকে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ বাংলা ভাষান্তর ও ভাব সম্প্রসারণ করতঃ (যা ব্রেকেটে - সিরাজী, উল্লেখপূর্বক) আমরা উপর্যুক্ত শিরোনামে পর্বে পর্বে প্রকাশের প্রয়াস নিয়েছি।

হযরত সুলতানুল মাশায়েখ বলেন: যে ব্যক্তি পথের মধ্যে কাঁটা বিছায় আর তার পথেও কাঁটা রাখা হয়; তাহলে যার মাল-সম্পদ সাবীল বা পথ আর তার রক্ত মুবাহ হয়, এমতাবস্থায় কারো মন্দ বলাতে ভয় কিসের? শত্রুতা করার প্রয়োজনই বা কী? উক্ত বাণীর পর বললেন- একসময় ঐ ধরনের এক দুর্ব্যবহারকারী লোক আসল, এসে অনেকগুলো অশালীন কথাবার্তা বলল। আমি কোন জবাব দেইনি। (অর্থাৎ- অশালীন আচরণকারী তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করবে বিষয়টি হযরত খাজা নিজামুদ্দিন মাহবুবে ইলাহী কাদ্দাছা ছিররাহুল আজীজ-এর নিকট দিব্যজ্ঞানে জানা ছিল, অথবা ভক্তদের উপদেশ সুলভ কালামগুলো করেছেন - সিরাজী)

সৃষ্টিকূলে মানবের আচরণ তিন ধরনের:- প্রথমতঃ এক ধরনের মানবের কাছ থেকে না কারো উপকার হয়, না কারো ক্ষতি, এ ধরনের মানুষ জড় পদার্থের মতো। অর্থাৎ প্রাণহীন বস্তু। দ্বিতীয়তঃ প্রথমোক্ত হতে আরো উত্তম, আর তাদের কাছ থেকে অন্যান্য মানুষ উপকৃত হয় কিন্তু কোন প্রকার ক্ষতি হয় না। তৃতীয়তঃ এ ধরনের ব্যক্তিরা প্রাগুক্ত উভয় ধরনের লোক হতে উত্তম। কেননা তাদের নিকট হতে অন্য লোকের উপকার ও কল্যাণ পৌঁছে। যদি কোন সময় অপর ব্যক্তি হতে তাদের নিকট দুঃখ পৌঁছে তাতে তারা বদলা বা প্রতিশোধ নেয় না বরঞ্চ ক্ষমা করে দেয়। আর মহৎ গুণটা হলো সিদ্দীকীন বা মহা সত্যপরায়ণ সম্প্রদায়ের গুণ।

এক বাদশাহ্‌র গল্পঃ সুলতানুল মশায়েখ বলেন: তারানী নামে এক বাদশাহ্ ছিলেন, তার খুবই প্রেমবন্ধন ছিল হযরত শাইখ সাইফুদ্দীন বাখেরজী (রহঃ) এর সাথে। যখন তাকে তার প্রজাগণ হত্যা করল, তখন তদস্থলে দ্বিতীয় আর এক বাদশাহ্ সিংহাসনে আরোহন করল। এক চুগোলখোর বা পরনিন্দুক ব্যক্তি নূতন বাদশাহ্‌র ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলো যার অন্তরে হযরত শেখ সাইফুদ্দীন বাখেরজীর প্রতি শত্রুতা ছিল। সে বাদশাহ্‌কে বলল: যদি আপনি আপনার দেশের শান্তি চান তাহলে শেখ সাইফুদ্দীন -এর মূলোৎপাটন করে দিন। কেননা তার কারণে দেশ হাতবদল হয়ে যায়। বাদশাহ্ উত্তরে ঐ চোগলখোরকে বললেন যে, তুমিই যাও যেভাবে পার শেখ সাহেবকে এখানে নিয়ে এসো। যখন এ চোগলখোর শেখ সাহেবের নিকট গেলো তখন সে ঔদ্ধত্য ও বেয়াদবীর সাথে তাঁর সম্মুখস্থ হলো। আর শেখ সাহেবের গলায় পাগড়ির কাপড় পেঁচিয়ে অসম্মানিতভাবে তাকে টেনে নিয়ে বাদশাহ্‌র নিকট গেল। বাদশাহ্ যখন শেখ সাহেবকে দেখলেন তখন অবিলম্বে তখ্‌ত বা রাজসিংহাসন হতে নেমে গেলেন এবং ক্ষমাভিক্ষা হেতু তাঁর চরণ যুগলে আপন মস্তক রেখে দিলেন (তাঁকে বাদশাহ্ নিজে সম্মানি সাজদাহ্ করলেন - সিরাজী)। এরপর বিভিন্ন ধরনের খিদমত ও সেবাকর্ম করতে লাগলেন আর মাফ চাইলেন। বললেন যে, আমি এভাবে বলিনি, যেভাবে আপনাকে নিয়ে এসেছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন। শেখ সাহেব ঘরে ফিরে গেলেন।

অন্যদিন বাদশাহ্ ঐ চোগলখোর বা পরনিন্দাকারী লোকটির হাত-পা বেঁধে শেখ সাহেবের খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে পাঠালেন যে, আমি হুকুম দিয়েছি তাকে কতল করে দেয়া হোক। তাকে যেন হত্যা করা হয়। এখন তাকে আপনার নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে। আপনি যেভাবে ইচ্ছে করেন তাকে কতল করে দেন। শেখ সাইফুদ্দীন বাখেরজী

(রহঃ) ঐ আসামীকে দেখামাত্র তার হাত-পায়ের বেড়ি খুলে দিলেন আর নিজের পরিধানের কাপড় তাকে পরিয়ে দিয়ে বললেন যে, তুমি আমার সাথে আমার ওয়াজ মাহফিলে যাবে। সেদিন ছিল সোমবার। তিনি তাকে নিজের সাথে ওয়াজ মাহফিলে আনলেন এবং মিম্বরে আরোহণ করে এই শেয়ের বা ছন্দটি পড়লেন-

آنہا کہ بجائے ما بدی ہا کردند ❁ گر دست رسد بچو کوئی کنم

* সুলতানুল মাশায়েখ বলেন- মানুষের কাছ থেকে যতগুলো নেক (ভাল) বদ (মন্দ) কর্ম প্রকাশিত হয়ে থাকে সে সব কর্মের মৌলিক খালেক বা স্রষ্টা হলেন জাতে ইলাহী। (অর্থাৎ সকল ভাল-মন্দ কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ্‌তায়ালা। মানুষ হলো কর্ম সম্পাদনকারী, তাই তারা প্রতিফল ভোগকারী - সিরাজী) যা কিছু পৌঁছে তা সব আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই আসে। এর উপর কারো অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। (আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকৃত সকল কাজে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে দেয়াটাই প্রকৃত মুমিনের আদর্শ - সিরাজী)।

আরো একটি বর্ণনা: সুলতানুল মাশায়েখ বলেন- যে, হযরত খাজা আবু সাঈদ আবুল খায়ের পথ চলছিলেন। কোন এক অসভ্য ব্যক্তি পেছন থেকে এসে অতর্কিতে ধমক দিল। তিনি পেছন ফিরে তার দিকে দেখলেন। তাতে সে বলল: আমাকে কী দেখছো, তুমি কি একথা বল নাই যে, যা কিছু সংঘটিত হয় আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হয়ে থাকে? তিনি তার উত্তর দিলেন- ঠিকইতো কিন্তু আমি দেখছি যে উক্ত কাজটি করার জন্য আল্লাহ্ পাক কোন বদবখ্‌তের (হতভাগার) নাম তালিকাভুক্ত করেছেন।

সোহবাত বা সঙ্গলাভ প্রসঙ্গে: হযরত সুলতানুল মাশায়েখ বলেন- সঙ্গলাভের স্বাদ তখন পাওয়া যায় যখন তাতে উপকারিতা থাকে। তা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। তার শ্রেণীভেদ রয়েছে। ঐ ধরনের সোহবাতের প্রভাব উত্তম হবে। এ সংক্রান্ত একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে সুলতানুল মাশায়েখ বলেন- যে, একবার ভ্রমণকালে শায়খুল ইসলাম বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (ক.সি.আ.) এক দরবেশের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন যে, মানুষেরা ঐ ব্যক্তির খোঁজ-সন্ধান করে যে নেক - সৎ লোকের পোষাক পরিধান করেছে। কিন্তু অনেক লোক এমন আছে যারা কাঁধে সাজ্জাদা-জায়নামাজ (মুছল্লা) রেখে নেককারদের আবরণে শয়তানী স্বভাব নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান রাখে। এমতাবস্থায় কীভাবে আসল-নকল পার্থক্য করা যাবে? তিনি উত্তরে বললেন- যে, ঐ ধরনের ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎলাভের পর নিজের বাতিন (অভ্যন্তরীণ) অবস্থা লক্ষ্য করা চাই। যদি অভ্যন্তরীন অবস্থা পূর্বের চেয়ে উত্তম হয় তাহলে বুঝতে হবে তিনি নেককার ব্যক্তি। আর যদি অভ্যন্তরীণ মন্দ হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে সে অসৎ লোক। এ প্রসঙ্গ এ ছন্দগুলো পাঠ করেন।

با ہر کہ نشستی و نہ شد شاد دلت ❁ وز تو نرسید زحمت آب و گلت

با او منشین جاں عزیزم زنہار ❁ زیرا کہ کند جان عزیزان بگلت

ইখওয়াত বা ভ্রাতৃত্ব প্রসঙ্গে: সুলতানুল মাশায়েখ (ক.) বলেন: ইখওয়াত বা ভ্রাতৃত্ববোধ তিন প্রকারের হয়ে থাকে- (১) ইখওয়াতে দোস্ত বা বন্ধুসুলভ ভ্রাতৃত্ব। (২) ইখওয়াত নিসবত বা সম্পর্কযুক্ত ভ্রাতৃত্ব। (৩) ইখওয়াতে দ্বীন বা ধর্মভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব। এসবগুলোর মধ্যে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অধিকতর শক্তিশালী। কেননা যদি দুই ভাই হয়, যাদের মধ্যে একজন মুসলমান দ্বিতীয়জন কাফের। তাহলে কাফের ভাইটি মুসলমান ভাইয়ের উত্তরাধিকারের হকদার হতে পারে না। কিন্তু দ্বীনি ইখওয়াত বা একই ধর্মভুক্ত ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দুনিয়া ও আখিরাতে উভয়স্থানে কায়েম থাকে। অতঃপর হযরত সুলতানুল মাশায়েখ (ক.) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন **الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين**

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি পৃথিবীর মধ্যে একে অপরের বন্ধু ছিল, আজ কিয়ামতের দিনে কতিপয় কতিপয়ের দুশমন - শত্রু। কিন্তু মুত্তাকী - খোদাভীরু পরস্পরের অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি আরো বলেন- নেককার বা সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্যে থাকার প্রভাব আবশ্যকীয়ভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে এ ঘটনাটি বিবৃত করেন যে, যখন আমিরুল মুমেনিন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) খলীফা হলেন তখন তাঁর ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়েছিল শাহে ইরাক বা ইরাক অধিপতির সঙ্গে। যুদ্ধে ইরাকের বাদশাহ গ্রেফতার হয়ে হযরত ওমরের দরবারে এসে গেল। তখন তিনি তাকে বললেন- **اما الاسلام اما السيف**

অর্থাৎ- হয়ত দ্বীনে ইসলাম কবুল করো নয়তো তলোয়ার। অর্থাৎ পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে আমি তোমাকে হত্যা করতে বাধ্য হবো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন যে তলোয়ার লও, ঐ বাদশাহ্ খুব জ্ঞানী ব্যক্তি ও বুদ্ধিমান ছিলেন। যখন তিনি এ অবস্থা দেখলেন তখন তিনি বললেন, আমি তৃষ্ণার্ত। আপনি আমাকে পানি পান করানোর আদেশ দান করুন। তিনি আদেশ করলেন, তখন কাঁচের বর্তনে পানি আনা হলো, বাদশাহ্ পানি পান করলেন না, ফারুকে আযম (রাঃ) ধারণা করলেন সে

বাদশাহ্ হয়ত সে সোনার বাটিতে পানি পান করতে চায়। এই ভেবে তার জন্য স্বর্ণের পেয়ালায় পানি আনা হলো। তাতেও সে পান করলে না। সে হযরত ওমর (রাঃ)কে বলল যে, আমি তৃষ্ণার্ত, আপনি আমাকে পানি পান করানোর জন্য আদেশ দান করেন। তাতে শেষ পর্যন্ত যখন মাটির পাত্রে পানি আনা হলো তখন বাদশাহ্ বলল, হে আমিরুল মুমেনিন! আমার সাথে ওয়াদা করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এ পানি পান না করব ততক্ষণ আমাকে যেন হত্যা করা না হয়। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন যে, আমি ওয়াদা করছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এ পানি পান না করবে ততক্ষণ আমি তোমাকে কতল - হত্যা করব না। এ অংগীকার শুনে বাদশাহ্ জলভরা মাটির পাত্রটি নিয়ে ভূমিতে ফেলে দিল। পাত্রটি ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেল আর পানি সব পড়ে গেল। তারপর বলতে লাগল যে, যেহেতু আপনার অংগীকার রয়েছে যে, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত এ পানি পান না করব ততক্ষণ আপনি আমাকে কতল করবেন না। এ কারণে আমি এখন আপনার আশ্রয়ে নিরাপদ আছি। হযরত ওমর (রাঃ) ঐ বদশাহর বুদ্ধিমত্তা দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং বললেন আমি তোমার প্রাণ ভিক্ষা দিলাম।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) পুনরায় ভাবলেন যে, অপর এক ব্যক্তি যিনি খুবই নেককার বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে সঙ্গে দিয়ে বাদশাহকে ইরাকে ফেরৎ পাঠালেন। সঙ্গী নেককার ব্যক্তিটি যেহেতু হযরত ওমর (রাঃ)-এর বন্ধু: বড়ই সৎকর্মপরায়ন ও সাধুপুরুষ ছিলেন। তাকে বাদশাহের সঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্য হলো তার সোহবাত বা সঙ্গলাভ যেন বাদশাহ্র উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলশ্রুতিতে তাই হলো - বাদশাহের মনে ভীষণভাবে ঐ ওলীআল্লাহ্র আছর বা প্রভাব পড়ল। ইরাক থেকে বাদশাহ্ হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট দূত প্রেরণ করলেন এ বার্তা নিয়ে যে, আমাকে আপনি আপনার নিকট ডেকে নিয়ে ঈমানের তলকীন করেন, অর্থাৎ কলমা পড়ান। শেষ পর্যন্ত ওমর (রাঃ) উক্ত বাদশাহ্কে তাঁর নিকট ডেকে এনে মুসলমান বানালেন - আলহামদুলিল্লাহ্। যখন মুসলমান হয়ে গেলেন তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন- এখন আমি ইরাকের পুরো অঞ্চল তোমাকে দান করছি। বাদশাহ্ বললেন- এখন পুরো ইরাক আমার কী প্রয়োজন? আমাকে শুধুমাত্র ইরাকের নিকৃষ্ট গ্রামটি দিয়ে দিন। ওমর ফারুক (রাঃ) বললেন, উত্তম কথা। ঐ বাদশাহ্ বললেন, আমার একটি অনাবাদি নিকৃষ্ট গ্রাম চাই যাতে করে সেটাকে আমি আবাদ করতে পারি। হযরত ওমর (রাঃ) সেখানে অনাবাদী নিকৃষ্ট গ্রাম খোঁজ করতে লোক পাঠালেন। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল সেখানে সকল গ্রামই আবাদি ও উৎকৃষ্ট। ঐ বাদশাহ্ বললেন: আমার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, আমি আপনাকে যেন সরেজমিনে প্রমাণ দিতে পারি যে, আমি ইরাক দেশকে উত্তম ও উন্নত অবস্থায়, উন্নত দেশ হিসেবে আপনার করতলে অর্পণ করছি। যদি এরপরে কোন গ্রাম অনাবাদী ও অনুন্নত হয়ে যায় তাহলে তার দায়-দায়িত্ব আপনার উপর বর্তাবে। কিয়ামতের দিন তার জন্য জবাবদিহিতা আপনাকেই করতে হবে। (এখানে একজন সুশাসকের কর্তব্য-নিষ্ঠা, দেশপ্রেম এবং আল্লাহ্র নিকট দেশ-জাতি ও শাসন কার্যের ব্যাপারে যে সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে সে শিক্ষারই প্রতিফলন ঘটেছে। দেশ ও জাতিকে নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে তাদের উক্ত বক্তব্য থেকে অনেক কিছু আদর্শিক শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। শুধু ক্ষমতা দখল মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া সমীচীন নয়। দেশ ও জাতির উন্নতি-অগ্রগতি ও সুখ-শান্তির কথা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা সকল সরকার প্রধানের কর্তব্য - সিরাজী)

উপরোক্ত কথাগুলো বলতে বলতে হযরত সুলতানুল মাশায়েখ খাজা নিজামউদ্দীন মাহবুব ইলাহী (ক.)-এর নয়ন মুবারক অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি ইরাকের বাদশাহ্-গভর্ণর এর জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধির অনেক প্রশংসা করলেন এবং বললেন- যে যখন সুলতান কুতুবউদ্দীন (ক.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো তখন আমি তাঁর সাথে একথাই বলেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مامن صاحب يصحب صلاحيته او ساعته من ليل اونهار الايسئل الله عن صحبته هل اديت فيها حق الله ام لا

অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন মানুষকে তার সঙ্গলাভের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি কোন নিয়তে কোন উদ্দেশ্যে তার সঙ্গী হয়েছ আর সাহচর্য্যের হক বা প্রাপ্য কিভাবে আদায় করেছ? ঐ সঙ্গলাভের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার হকও কী আদায় করেছ না কর নি?" খাজা নিজাম (ক.) আরো বলেন- শেখ জুনাইদ বাগদাদী (ক.) বলেন-

وجدت ربى فى بسئل المدينة অর্থাৎ- আমি আমার রব - প্রভু (মহান আল্লাহ্)কে মদীনা মুনাওয়ারার গলিগুলোর মধ্যে পেয়েছি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো তা কীভাবে? বললেন- একদিন আমি মদীনা শরীফের বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে আমি খুবই রিক্ত নিঃস্ব এক ব্যক্তির দেখা পেলাম। তাঁর দুর্দশাগ্রস্ততার উপর আমার করুণা

হলো। আমি তাকে দয়া দেখাতে চাইলাম, তাকে সঙ্গ দিতে চাইলাম। সুতরাং আমি তার সাথে কিছুদিন অবস্থান করলাম। তাতে আমার জানা হয়ে গেল যে, বাস্তবেই আল্লাহ্‌তায়ালা ভগ্ন হৃদয়ের লোকদের সাথে থাকেন। যেমনি আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমান: انا عند المنكسر قلوبهم অর্থাৎ- আমি ভগ্নহৃদয় বিশিষ্ট লোকদের নিকটেই থাকি। খাজা হাকিম সিনাঈ বলেন-

آنکہ خود را شکست دل چند ہ است شاکست خدائے کریم
من بعالم دروں نے دانم ہ دوستی زاں ہمیشہ میرانم

হযরত সুলতানুল মাশায়েখ (ক.) বলেন:

حسن الخلق ان لا يتاثر القلب بخفاء الخلق بمطالعة فعل الحق

অর্থাৎ- হুছনে খুলক বা সৎস্বভাব এর সংজ্ঞা হলো: আল্লাহ্‌তায়ালার কর্মকে দেখার - অধ্যয়নের কারণে মানবাত্মার মধ্যে কোনরূপ অসন্তুষ্টি পরিলক্ষিত হয় না। খাজা নিজাম (ক.) আরো বলন- হযরত খাজা হাসান বসরী আমিরুল মুমেনিন আলী কররামাল্লাহু ওয়াজহাহু থেকে বর্ণনা করেন যে, হুছনে খুলক বা সৎচরিত্রের এক তৃতীয়াংশ হলো হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা অর্থাৎ হালাল খাওয়া। আর দুই তৃতীয়াংশ হলো আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের সাথে সদাচরণ করা। একসময় জনাব সরওয়ারে কায়েনাত মুফাখ্‌খারে মওজুদাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এবং হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) উভয়কে কাঁধের উপর বসিয়ে উটের মতো আওয়াজ করতে করতে ঘরের আঙ্গিনায় বেড়াচ্ছিলেন। হযরত আমিরুল মুমেনীন আলী (কাঃ) এ দৃশ্য দেখে বললেন- কী সুন্দর স্বভাব! এবং হাসান-হুসাইন (রাঃ)কে উদ্দেশ্য করে বললেন- কতই না উত্তম উট (বাহন)। এ কথা শুনে রাসূলে পাক (দঃ) বললেন- বরং এটাই বলো যে, তোমরা দুজন কতই না উত্তম আরোহী।

খাজা নিজাম (ক.) আরো বললেন- যে শেখআবু সাঈদ আবুল খায়ের (রহঃ) এবং হাকীম বুআলী ছীনা (রহঃ) উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হলো, যখন একে অপরের কাছ থেকে পৃথক হলেন তখন হাকীম বুআলী ছীনা শেখ আবু সাঈদের সহচর এক সূফি দরবেশ ব্যক্তিকে বললেন- যে, আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্পর্কে শেখ সাহেব যা কিছু বলেন তা আমাকে জানাবেন কিন্তু। দু'একদিন যাবৎ হাকীম সাহেবের ব্যাপারে শেখ সাহেব কোনকিছুই ভালমন্দ বললেন না। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় দিন ঐ সঙ্গী সূফি ব্যক্তি শেখ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, বুআলী ছিনা সম্পর্কে আপনার মাতমত কী? উত্তরে তিনি বললেন- তিনি হাকীম (চিকিৎসা বিজ্ঞানী), তিনি তাবীব (চিকিৎসক), তিনি আলেম (ধর্মজ্ঞানী) কিন্তু তিনি মাকারেমুল আখলাক বা অনুপম চরিত্রের অধিকারী নন। যখন ঐ সূফি সাহেব শেখ সাহেবের ঐ মন্তব্যের কথা হাকীমকে অবহিত করলেন তখন তিনি শেখ সাহেবের উদ্দেশ্যে পত্র লিখলেন, আমি তো কয়েকটি কিতাব مكارم اخلاق বা প্রশংসা-মাধুর্যপূর্ণ স্বভাব সম্পর্কে রচনা করেছি। আর আপনি বলেছেন আমার মধ্যে মকারেমে আখলাক বা প্রশংসনীয় চরিত্র নেই। প্রত্যুত্তরে শেখ সাহেব বার্তাবাহক পাঠালেন যে, আমি তো এ কথা বলি নি, আপনার নিকট মকারেমে আখলাক বা সৎচরিত্রের ইলম-জ্ঞান নেই। আমি তো একথা বলেছি যে, আপনার মধ্যে মকারেমে আখলাক বা সুন্দরতম-মাধুর্যমণ্ডিত চরিত্র বিদ্যমান নেই। (এখানে নিজ জীবনে সুন্দর চরিত্র বাস্তবায়িত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে শুধু এ বিষয়ে জানা বা জ্ঞান থাকলে চলবে না। - সিরাজী)।

সূফি উদ্ধৃতি

■ ধৈর্যশীল দরবেশের মরতবা বেশী যেহেতু সে কেবল দিবা-নিশি আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকে। পক্ষান্তরে কৃতজ্ঞ মালদারগণ অনেক সময়ই ধন-দৌলতের ভাবনা ও হিসাব-নিকাশে মূল্যবান সময় নষ্ট করে।

–হযরত হাসান বসরী (রঃ)

■ মানুষের জন্য দু'টো বিষয়ই মূল কথা। তার একটি হল, যে জিনিস আমার জন্য রাখা হয়েছে তা আমিই পাব। যদি তার থেকে আমি দূরে পালিয়ে যাই তবু তা আমার পিছনে পিছনে ছুটে যাবে। আর দ্বিতীয়টি হল, যা আমার জন্য নয় অর্থাৎ অপরের জন্য রাখা হয়েছে তা লাভ করার জন্য আমি যত বেশী পরিশ্রম এমনকি প্রাণপাত করি না কেন, কিছুতেই তা লাভে সক্ষম হব না।

–হযরত আবু হাশেম মক্কী (রঃ)

হযরত ছৈয়দ রাহাত উল্লাহ্ শাহ (র.)

● ছালেহ সুফিয়ান ফরহাদাবাদী মাইজভাণ্ডারী ●

হুজুর কেবলা (রাহঃআঃ)'র জন্ম স্থান চট্টগ্রামের মর্যাদাঃ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য যিনি নিজ মা'রফত তথা ওয়াহ্দানিয়ত প্রচার করার জন্য অসংখ্য আউলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ওলামায়ে কেরামকে নায়েবে রাসূল হিসেবে মনোনীত করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ ও জন্ম করান। অসংখ্য দরূদ সালাম হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পবিত্র বংশ এবং সাহাবীদের উপর যিনি নিজেই এরশাদ করেন, উচ্চারণঃ- হায়াতী খাইরুল্লাকুম ওয়ামামাতী খাইরুল্লাকুম। অর্থঃ- আমি নবীর হায়াত এবং ওয়াফাত উভয় আপনারা জগত বাসীর জন্য কল্যাণ। এমতে পবিত্র চট্টগ্রামেও আউলাদে রাসূল ও পীর মশায়েখগণ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছেন এবং পরবর্তীতে তাঁদের বংশ হতে অসংখ্য নক্ষত্র এ চট্টগ্রামে আবির্ভূত হন। যার দরুন সুন্নীয়তের নিরিখে ইসলামের খেদমত করার জন্য এই পবিত্র চট্টগ্রামে তাদের শূন্যতা ছিল না। তাই ফরহাদাবাদী (রহঃআঃ-১৮৬৬-১৯৪৪) বলেন,

কে-ই-বালদাহ্ কে নামশ্ চাটগাম আস্ত,
মক্বামে ফাজেলী জী ইহ্তেশাম আস্ত।

ভাবার্থঃ এই চট্টগ্রাম সম্মানিত আউলাদে রাসূল,পীর মশায়েখ ও দ্বীন ধর্মের খেদমত গার আলেম ওলামাদের জন্মস্থান (শাওয়াহিদুল ইবতিলাত ফী তারদী দে-মা-ফী রাফিউল ইশকালাত ২য় পৃঃ দ্বিতীয় প্রকাশ-২০১১)

গাউছুল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর খলিফা বাহরুল উলুম আল্লামা ছৈয়দ আব্দুল গণি কাঞ্চনপুরী (রাহঃ আঃ) বলেন,

"হার হার জাগে গুজর হে আউলিয়া-এ-কেরাম,
নবী কা বিহিহে নক্বশে-কুদম ছাটগাম কু।

ভাবার্থঃ সম্মানিত চট্টগ্রামের প্রতি অলিতে গলিতে বা প্রত্ন জায়গায় আউলাদে রাসূল, আউলিয়া এ কেরাম ও সুন্নীয়তের হক্কানী রব্বানী ওলামা এ কেরামের অবস্থান। এমনকি এখানে নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র কুদমের নক্বশা মুবারকও আছে। তাই আউলাদে রাসূলদের উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমাম শেরে বাংলা (রহঃ আঃ) বলেন,

দর ইরম্ আরামে গাহশ আঁকে ইকরামশ্ কুনদ,
দর জাহান্নাম বুদে বাশ মুনকেরানে চাটগাম।

ভাবার্থঃ চট্টগ্রাম তথা ইহার জমিনে আবির্ভূত আউলাদে রাসূল ও পীর মাশায়েখদের সম্মান ও তাঁদের প্রচারিত আক্বিদা ও আমল যার অন্তরে ও জীবনে বাস্তবায়ন আছে তিনি বেহেস্তি আর তাঁদের মর্যাদার অস্বীকারকারীদের ঠিকানা জাহান্নাম (দিওয়ানে আজিজ ১৮৫ পৃষ্ঠা)।

প্রাককথনঃ এ মহান আশেক্বে রাসূল অলিয়ে কামেল সম্পর্কে কিছু লেখার যোগ্যতা আমার নেই। যাঁর সম্পর্কে ইমাম শেরে বাংলা (রহঃআঃ) বলেন,

হয়রত শাহ্ রাহাত উল্লাহ ছাকিনে মরিয়ম নগর
পেশওয়া-এ-আলেমানো হাম মুজাদ্দেদ ফিল আছর।

ভাবার্থঃ- মরিয়ম নগরের বাসিন্দা হয়রত আল্লামা মুফতী শাহ্ ছৈয়দ রাহাত উল্লাহ (রহঃ আঃ) মসলকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমদের পথ প্রদর্শক এবং বাতেল আক্বিদার বিরুদ্ধে সুন্নিয়তের ফাতওয়ার ব্যাপারে যুগের মুজাদ্দেদ বা সংস্কারক ছিলেন (দিওয়ানে আজিজ)। ইমাম শেরে বাংলা (রহঃ আঃ)'র এই মন্তব্য হতে আমরা বুঝে নিতে পারি যে, চট্টগ্রাম শরীফে সুন্নীয়তের খেদমত, শরীয়ত তরীক্বত ও প্রতিষ্ঠানিক ভাবে করার জন্য কোন সময় ছৈয়দ জাদা তথা আউলাদে রাসূল, হক্কানী রব্বানী পীর মশায়েখ ও আলেম ওলামাদের অভাব অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নেই আল্লাহর রহমতে আগামীতেও থাকবে না। বরং চট্টগ্রাম শরীফের আউলাদে রাসূল বা ছৈয়দ জাদা ও পীর মশায়েখগণ পাক, বাংলা ও ভারত উপমহাদেশে ইসলামের মূল ধারা সুন্নীয়ত ভিত্তিক মাযহাব ও মিল্লাতের খেদমত শরীয়ত, তরীক্বত, প্রতিষ্ঠানিক, লিখনি ও মুনাজেরার মাধ্যমে করে মানুষের অন্তর রাজ্য নবী অলির প্রেম ও ভালবাসা ঢুকায়ে দিয়ে উর্বর করে রাখেন। যা চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক মির্জাখিল দরবারের শরাফতের প্রতিষ্ঠাতা শেখুল আরেফীন আল্লামা ছৈয়দ মোখলেছুর রহমান বিন ছৈয়দ গোলাম আলী (রাহঃ আঃ ১২২৯হিঃ ১৩০২)'র লিখনি বাতেল মতবাদের ফাতওয়া "তাক্বিয়াতুল ঈমানের" খন্ডনে "শরহোছছুদুর ফী দাফইশ্ শুরুর" ফার্সি ভাষায় যা বর্তমান উর্দু ভাষায় "তানক্বীদে তাক্বিয়াতুল ঈমান" ঐতিহাসিক সাক্ষ্য। (ইহা হুযুর আ'লা হযরত, ইমাম আহামদ রেজা খান ফাজেলে ব্রেলভী বিন আল্লামা মুফতী নক্বী খান (রাহঃ)'র পূর্বে লিখিত) বিশেষ করে এই চট্টগ্রাম শরীফের মানবের হৃদয় ইশক্বে রাসূলে উজ্জীবিত বিধায় যেকোন দেশের সুন্নী পীর মশায়েখ ও আলেম ওলামা এখানে এসে অনায়াসে বিভিন্ন প্রকার সম্মান ও খেদমত করার সুযোগ পায় এবং চট্টগ্রাম শরীফের পীর মশায়েখ, ওলামায়ে কেরাম এর পরিবেশে এসে বিশেষ করে মাজার শরীফস্থ গাউছুল আ'যম ও অন্যান্য অলিদের দরবারে যেয়ারত ও মুরাক্বাবা মুশাহেদা করে নিজ রুহানিয়ত উরুজিয়তের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। চট্টগ্রাম শরীফের আউলাদে রাসূল ও পীর মশায়েখদের শুকরিয়া আদায় না করলে এবং এ সত্য

কথা সম্মানিত কোন গুণিজন অস্বীকার করলে ইহা ইতিহাসের চরম বিকৃতি হবে।

আলেমে মাকানা ওয়ামা ইয়াকুনু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র হাদিছ উচ্চারণঃ "মান্‌লাম্ ইয়াশকুরিন্নাছা ফা-লাম্ ইয়াশ কুরিল্লাহা।" অর্থাৎ যেজন গুনিজনের শুকরিয়া আদায় করে না সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না।

হুজুর কেবলা (রহঃআঃ)'র পবিত্র বংশ, জন্ম ও শিক্ষাঃ- তাঁর পূর্ব পুরুষ আরব হতে ভারত ও চীন এবং চীনের পাদদেশের পাহাড় পর্বত ভ্রমণ করে বর্তমান রাঙ্গুনিয়া থানার মরিয়ম নগরে বসতি স্থাপন করেন। যেটাকে সৈয়দ বাড়ী হিসেবে অত্র অঞ্চলের সবাই চিনেন। এই বাড়ীর জনাব রজব আলীর পবিত্র বংশে আনুমানিক ১২৯৩ হিজরী সনে হুজুর কেবলা আল্লামা ছৈয়দ মুহাম্মদ রাহাতুল্লাহ শাহ (রহঃআঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা পারিবারিকভাবে পাওয়ার পর ও তৎকালিন পোমরা হাজী বাড়ী নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ রহমত উল্লাহ শাহ (রহঃআঃ)'র খেদমতে থেকে সমাপন করেন। মসলকে আহলে সুন্নাতের নিরিখে জাহের বাতেন জ্ঞান না থাকলে আল্লাহ পাকের মারেফত হাছেল করা অসম্ভব। যথা শেখ সা'দী (রহঃআঃ)'র ভাষায়-

ছো শাময়ে আজ ইল্‌মে বায়দ গদাখ্‌ত
কে বে-ইল্‌মে না-তাওয়া খোদা রা শেনাখ্‌ত।

ভাবার্থঃ- জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য অর্জন অসম্ভব। তাই জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে মোমের মত গলে যাও। এই মতে তিনি পারিবারিক ভাবে অনুমতি নিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারতের শ্রেষ্ঠ আলেমেদ্বীন আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ গুল কাহেলী (রহঃআঃ) প্রতিষ্ঠিত মুরাদাবাদের মাদ্রাসায়ে ইমদাদিয়া দরসে নেজামীতে ভর্তি হন। তথায় তিনি সর্ব বিষয়ের উপর গভীর জ্ঞান হাছিল করে দস্তারবন্দী হন। দেশে আসার পর হতে তার চতুর্মুখী জ্ঞান দেখে এক বাক্যে তাঁকে সবাই বড় মাওলানা সাহেব হিসেবে ডাকতেন।

সংসার জীবন ও ছেলে সন্তানঃ- প্রীয় নবীর সুন্নাতের অনুসরণে তিনি আনুমানিক ১৯১৩ ইসাব্দে চন্দ্রঘোনা নিবাসী অতীব পরহেজগার ও সম্মানি আলেম মৌলানা ছালেহ আহমদ (রহঃআঃ) সাহেবের প্রথম কন্যা সৈয়দা আমেনা খাতুন কে শাদী করেন। তাঁরই পবিত্র গর্ভে ১৯১৪ ইসাব্দে চট্টগ্রামে ১৯৬৫ সালে হজ্ব থেকে আসার পর হতে জস্‌নে জুলুসের সর্ব প্রথম প্রবক্তা আল্লামা ছৈয়দ নুরুচ্ছফা নঈমী (রহঃআঃ), অলিয়ে কামেল মাওলানা ছৈয়দ বিছমিল্লাহ শাহ (রহঃআঃ) ও শাহজাদী ছৈয়দা আমাতুন ওয়ারেছ জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহর হুকুমে তিনি ওফাত হওয়ায় তাঁরই দ্বিতীয় বোন ছৈয়দা রুহ আফজাহকে শাদী করেন। তাঁর পবিত্র ঔরশে শাহজাদী ছৈয়দা জান্নাতুল কুদ্দুস নামে এক কন্যা সন্তান তাশরিফ আনেন। তিনি ইন্তেকালের পর তারই তৃতীয় বোন ছৈয়দা মুহাম্মদ খাতুনকে বিবাহ করেন। তাঁরই পবিত্র রেহমে ছৈয়দ খোরশেদ ও ছৈয়দ মুর্শেদ জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহর অসীম হেকমত কিছুদিন পর উভয় সন্তান ও মাতা জান্নাত বাসী হন। পরবর্তীতেও তারই ৪র্থ বোন ছৈয়দা ছালেহা খাতুনকে শাদী করেন। তাঁরই পবিত্র গর্ভে জন্ম নেন মাওলানা ছৈয়দ মুহাম্মদ হুজুর আনোয়ার ও এক কন্যা যাঁর পবিত্র নাম বিবি নক্সবন্দী। হুজুর কেবলা (রহঃআঃ) এই সংসার জীবনের শান একমাত্র প্রকৃত সুফি সাধকগণই বুঝবেন। আল্লামা রূমী (রহঃআঃ) বলেন, উচ্চারণঃ-

ইল্‌মে হক দর ইল্‌মে সুফী গুম্ শাওয়াদ
ই ছুখন কাই বা ওয়ারে মরদুম শওয়াদ।

ভাবার্থঃ- আল্লাহর প্রকৃত রাজ রহস্যের জ্ঞান প্রকৃত সুফি সাধকের জ্ঞানে নিহিত। তা সাধারণ মানুষের বুঝার সাধ্য নেই।

ত্বরীকৃত জীবনঃ- হুজুর আল্লামা রূমী (রহঃআঃ) বলেন-

ইল্‌মে গর তন জনি মারে শাওয়াদ
ইল্‌মে গর দিল জনি ইয়ারে শাওয়াদ।

ভাবার্থঃ- আমাদের জ্ঞান যদি শুধু বাহ্যিক বেশভূষার উপর অবস্থান করে তাহলে তা বিষধর সর্প হয়ে ঈমান ও আমলকে ভক্ষণ করবে। আর যদি তা কুলবের সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন বন্ধু হয়ে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবে। মুফতীয়ে আ'যম আল্লামা ফরহাদাবাদী (রহঃআঃ) বলেন-

দর দিলে আশেকছে রাহাত গর বিছালে ইয়ারে নিস্ত
দরদে মন্দে ইশকুরা দারু ব-জুজ্ দীদারে নিস্ত।

ভাবার্থঃ- বন্ধুর মিলন ব্যতীত প্রেমিকের অন্তরে কোন শান্তি নেই। মাশুকের সাক্ষাত ব্যতীত প্রেম রোগের কোন ঔষধ নেই (তোহফাতুল আখইয়ার)। আমাদের এই আত্মা পরম আত্মার (আল্লাহর) সাথে মিলনের জন্য উপযুক্ত গুরুর দরকার। পাক ভারত উপমহাদেশে যাঁদেরকে সম্মানপূর্বক পীর সাহেব বলা হয়। এজন্য আল্লামা রূমী (রহঃআঃ) অন্যত্র বলেন-

পীর-রা-বগুজী কে বে পীর ই ছফর + হাস্ত বছ পুর আ-পতো খাওপোখতর। ভাবার্থঃ- আল্লাহকে পাওয়ার ছফরের পথে বহু বিপদ আছে, তাই কামেল পীর ধরুন। কেননা এ পথ খুবই ভয় ও বিপদময়। এজন্যই তিনি এ চিন্তায় সবসময় মগ্ন থাকতেন। আল্লাহর হুকুমে তিনি ইসলামের ৪র্থ রুকন হজ্ব পালন করতে যান। তথায় তারই মনোনীত পীরে কামেল প্রখ্যাত অলিআল্লাহ আল্লামা ছৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল হক মুহাজেরে মক্কী নক্সবন্দী (রহঃআঃ)'র খেদমতে উপস্থিত হয়ে পবিত্র মক্কা শরীফের মসজিদুল হেরমের ভিতরে তার দস্তে মুবারকে বাইআতে রাসূল গ্রহণ করেন। তথায় কিছুদিন তিনি পীরের ছোহবতে থাকার পর খেলাফতের স্বীকৃতি স্বরূপ একটি জুব্বা ও লাঠি মুবারক লাভ করেন। দেশে আসার পর তিনি তৎকালীন ইমামুত ত্বরীকৃত গাউসুল আ'যম মাইজভান্ডারী

হতে ফয়জে ইজেহাদী লাভ করেন বিধায় গাউসুল আ'যম মাইজভান্ডারী খলিফাদের তালিকায় তার পবিত্র নাম উল্লেখ আছে।

মাদ্রাসা দেওয়ার প্রেক্ষাপট:- ১৭০৩ ঈসাব্দে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নুদী জন্মগ্রহণ করে পরবর্তীতে মসলকে আহলে সুন্নাতের বিপরীত বাতেল ওয়াহাবী মতবাদ প্রচারে কিতাবুদ তাওহীদ, কাশফুশ শোবহাত ইত্যাদি কিতাব লিখে ফিৎনা আরম্ভ করেন। এ কিতাব এর খন্ডন তারই ভাই আল্লামা সোলাইমান বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদী (রহ:আ:) "আছ্ ছাওয়ায়িকুল ইলাহিয়্যাহ ফি রাদে আলাল ওয়াহ্হাবিয়্যাহি" লিখে প্রচার করেন। পরবর্তীতে ভারতের রায়ব্রেলরীর অল্প শিক্ষিত ছৈয়দ আহমদ ১৮২২ ঈসাব্দে হজ্ব করতে গিয়ে ইহার প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে ভারতে তাঁর শিষ্য ইসমাইল দেহলভী দ্বারা "তাক্বিয়াতুল ঈমান, চিরাত্বাল মুস্তাক্বীম" ইত্যাদি কিতাব লিখে দেওবন্দী আলেমরা সহ এটা প্রচার করেন। আমাদের দেশের সুন্নী পরিবারের সন্তানেরাও দেওবন্দ হতে পড়ে এসে ঐ আক্বীদা প্রচারের জন্য চট্টগ্রামে ১৯০১ সালে হাটহাজারী ওয়াহাবী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়ে মৌলভী ফয়জুল্লাহ সাহেব রফিউল ইশকালাত নামক বদ আক্বীদার কিতাব লিখে সুন্নী সমাজে ফিৎনা ছড়ায়। ইহার খন্ডনে আল্লামা ফরহাদাবাদী "শাওয়াহিদুল ইবাতিলাত ফি তারদীদে মাফি রাফিউল ইশকলাত" লিখে জনসম্মুখে পেশ করেন।

ওয়াহাবী ইজমের প্রচার প্রসারের মূল হেকমত, মাদ্রাসা, মসজিদ ও প্রকাশনা। এর মাধ্যমে তারা অগ্রসর হচ্ছে। মুসলমানদের ছেলেকে আরবী পড়ালেই তাদের ওখানে দিতে হত। কোন ধর্মীয় বই কিনতে হলে তাদের লিখা বই কিনতে হত। যা-আফসোস করে হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ারখান নঈমী (রহ:আ:) বলেন-

আহলে সুন্নাত বাহ্রে ক্বাউয়ালী ওয়া উরস
দেওবন্দী বাহ্রে তাছনিফাতো দরস।
খরছে সুন্নী বর কুবুরো খানে ক্বাহ
খরছে নজদী বর উলুমো দর সগাহ।

ভাবার্থ:- সুন্নী অনুসারীরা পবিত্র ওরস ও ক্বাউয়ালি নিয়ে ব্যস্ত তৎপরিবর্তে দেওবন্দী ওয়াহাবীরা লেখা পড়া ও প্রকাশনা নিয়ে ব্যস্ত। সুন্নীদের ব্যয় পবিত্র মাজার ও খানক্বা শরীফ কেন্দ্রিক অন্যদিকে নজদী ওয়াহাবীদের ব্যয় জ্ঞান, লেখা পড়া ও প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক (দিওয়ানে সালেক ৬১পৃ:) পবিত্র কুরআনে নির্দেশ-উচ্চারণ:- ক্বু-আন ফুছাকুম ওয়া আহলিকুম নারা। অর্থাৎ নিজ এবং নিজের পরিবার তথা জগতবাসীকে জাহান্নামী আক্বীদা ও আমল থেকে রক্ষা কর। এই আয়াতের মর্ম ও বিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় প্রেক্ষাপট মতে তিনি রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী হযরত ক্বাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু তালা আনহুর মাধ্যমে স্বপ্নে নির্দেশ প্রাপ্ত নির্দিষ্ট স্থানে নির্দেশিত নাম অনুযায়ী মাদ্রাসা-এ-তাওয়াক্কলিয়া নামক মসলকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মহান মরকজ এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। যা বর্তমানে রাঙ্গুনিয়া নুরুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসা হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত।

পবিত্র বেছাল শরীফ:- এই মহান ধর্ম প্রচারক ও সুন্নীয়তের মহা স্মরণীয় পবিত্র জাত অনুমানিক ৮১ বা ৮২ বৎসর পবিত্র জাহেরী হায়াতের পর ১৩৭৫ হিজরী ও ১৩৭২ বাংলায় বেছাল শরীফ লাভ করেন। ওয়াছালে হাবীবু ইলাল হাবীব। প্রতি বৎসর তাঁরই ওফাত দিবসে মসলকে আহলে সুন্নাতের নিরিখে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ "ওয়াজাক্কির হুম বি আইয়ামিল্লাহ" এর মর্মবাণী মতে ওরস শরীফ, ওয়াজ মাহফিল, জিকির ও মিলাদ শরীফ সহ যুগোপযোগী বিভিন্ন শরীয়ত সমর্থিত কর্মকান্ডের মাধ্যমে অতীব যাকজমকের সাথে উদযাপিত হয়। তাঁর বর্তমান বংশধরদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর পীরে তাফাইয়ুজ গাউসুল আ'যম মাইজভান্ডারীর উসুল মতে যুগের হেকমত অনুযায়ী শরীয়ত সম্মত ছেমা মাহফিল করে থাকেন। কারণ এতে আল্লাহ পাকের রাজ রহস্য নিহিত আছে। আল্লামা রুমী মছনবী শরীফে বলেন :-

বহু গেজায়ে আশেক্বাঁ আমদ্ ছেমা
কেদর উ বাশদ্ খেয়ালে ইজ্তেমা।
কুওয়াতে গীরদ ওয়াখিয়ালাতে জমীর
বল্কে ছুরত গরদদ্ আজ বাংগে ছফীর।
আতশে ইশক্ব আজ না ওয়াহা গছে নিজ
আঁ ছুনাকে আতশে আঁ জুযে রেজা।
যে নু গমায়ে তা-খোদা এক কুছা রাহে আছ্
বরী হরফে পিন্হা আছ্ আন্দর যে রো বম
ছিররে হক পিনহা আছ্ আন্দর যেরো বম
ফাশ আগর গুয়ম্ জাহাঁ বরহাম্ জনম্।

ভাবার্থ:- নিখুত ছেমা আল্লাহর প্রেমিকগণের রুহের খোরাক। কারণ তাতে আল্লাহর সাথে মিলনের খিয়ালই বিরাজিত। অন্তরের মধ্যে আল্লাহপাকের মিলনের যে খেয়াল বিরাজ করে তা ছেমা দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হয়। এমন কি বাজনা ও সুরের শব্দের দ্বারা ছুরত পর্যন্ত পরিবর্তন হয়। আগুনের মধ্যে কয়লা বা লাকড়ি দিলে যে ভাবে তা অধিক হারে জ্বলে উঠে, তদ্রুপ বাজনা ও সুরের দ্বারা অন্তরে আল্লাহর প্রেমের আগুন জ্বলে উঠে। আল্লাহ রাসূল ও পীর মুর্শিদের প্রশংসামূলক গান, গজল, নাত ইত্যাদি আল্লাহকে পাওয়ার পথকে প্রশস্ত করে। এর জন্য বাঁশী, গান ও সুরের মধ্যে আল্লাহ পাকের যে রাজ রহস্য নিহিত, তা যদি বর্ণনা করা যায় জগত উলট পালট হয়ে যাবে (তোহফাতুল আখইয়ার প্রথম খন্ডের ১৩৪/১৩৫ পৃ:দ্র)।

কারামত:- মু'জিজাতুল আম্বিয়া এ ওয়া কারামাতুল আউলিয়া এ হাক্বুন ফামান আনকারা হুমা ফাক্বাদ দাল্লা। অর্থাৎ নবী রাসূলদের মু'জেজা এবং অলিদের কারামত সত্য তা যারা

অস্বীকার করে তারা গোমরাহ বা বাতেল ফেরকার অন্তর্ভুক্ত। মসলকে আহলে সুন্নাতের নিরিখে তাঁদের মু'জেজা ও কারামত পবিত্র জীবদ্দশায় নয় বরং আলমে বরজখ বা কবর জগতে ও জারী থাকে। এজন্য তাঁদের পবিত্র দরবার শরীফে ওফাতের পরও অসংখ্য হাজতী মাকছুদী আশেকের ঢল। এর বাস্তব প্রমাণ শাইখুল ইসলাম বাহরুল উলুম আল্লামা মুফতী ছৈয়দ রাহাত উল্লাহ শাহ্ নক্শবন্দী মাইজভান্ডারী (রহ:আ:)। তাঁর ওফাতের ০৩(তিন) বৎসর ০৮ (আট) মাস পর তাঁর খাদেম ও ছাত্র এবং আল্লামা ফরহাদাবাদী (রহ:আ:)'র খলিফা মাওলানা ছৈয়দ রুহুল কুদ্দুস শাহ্ ফরহাদাবাদীকে স্বপ্নে দেখান, তার তাবুতে উই পোকা ধরছে। তা যেন বদলিয়ে দেয়া হয়। একই স্বপ্ন তাঁরই বড় ছেলে সাজ্জাদানশীন আল্লামা মুফতী ছৈয়দ নুরুচ্ছফা নঈমী, নক্শবন্দী আশরাফী ফরহাদাবাদী সাহেব কেবলাকেও দেখান। ফলে উভয়ে অন্যান্য মৌলানা সাহেবদেরকে নিয়ে তাবুত পরিবর্তন করে দেন। তারা সবাই তার কাফন ও শরীর হুবহু অক্ষত এবং অতীব বেহেস্তী সুগন্ধযুক্ত অবস্থায় পান। সুবহানাল্লাহ! পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত:- উচ্চারণ:- আল্লাল্লাহা হররামা আলাল আরদি আনতা'কুলা আজসাদাল আম্বিয়াআ। অর্থাৎ আল্লাহ পাক জমিনকে হারাম করে দেন, যাতে নবীদের পবিত্র শরীরকে ভক্ষণ না করে (মিশকাত শরীফ কিতাবুল জু'মা ----)। অতএব আমরা একথা সবাই জানি যে, গাছের মূল জীবিত থাকলে তার শাখা প্রশাখা অবশ্যই জীবিত থাকে। তাই নায়েবে রাসূলদের মূল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজ রওজা শরীফে জীবিত, তাহলে তাঁর শাখা প্রশাখা পৃথিবীর সমস্ত নায়েবে রাসূল তথা ওলি, গাউস, কুতুব, আব্দালগণ অবশ্যই জীবিত। তাই আলা হযরত ফাজেলে বেরলবী (রহ:) বলেন- উচ্চারণ:- ✪ তু জিনদাহে ওয়াল্লাহ তু জিনদাহে ওয়াল্লাহ + মেরে চশমে আ'লমছে কে চুপ জানে ওয়ালে।✪ চমক তুজছে পাতেহে কে ছব পানে ওয়ালে + মেরে দিলকো বিহি চমকাদে কে চমকানে ওয়ালে।

উপসংহার:- আমাদের পূণ্য মাতৃভূমি বাংলাদেশের বর্তমানে ২০১৩ তথা এক বিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপট অনুযায়ী চিন্তা করলে আমরা সুন্নীগণ মনে হয় বাতেলদের চতুর্মূখী কর্ম কান্ডের তুলনায় অসচেতন অবস্থায় আছি। এ ভাবে থাকলে পবিত্র মক্কা-মদিনায় যে হারে তারা অসংখ্য মাজার শরীফ শহীদ করে দিয়ে বর্তমান তাদেরই রাজত্ব করে নিয়েছে, আমাদের দেশের অবস্থা মনে হয় এ রকম হতে আর বেশি দেরি নেই। ব্যাঙের ছাতার মত যেদিকে যাই সেদিকে তাঁদের প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও প্রকাশনা ইত্যাদি। আমাদের পূর্ববর্তী অসংখ্য সুন্নী মসজিদ ও মাদ্রাসা এবং সমাজ তাদের দখলে। তাদের মুরুব্বীদেরকে তারা স্মরণ করে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশনার মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশনার পরিবর্তে আমাদের সম্মানিত গুণীজন ও অলি আল্লাহদেরকে আমরা স্মরণ করি কিছু পূণ্যময় আমলের মাধ্যমে। অন্যদিকে আমাদের অনুসারীদেরকে মুখে বলি তাদের প্রতিষ্ঠানে ছেলে সন্তান দিবেন না, তাদের বই কিনবেন না এবং তাদের সংগঠন করবেন না। অন্য দিকে আমরা কোন প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা ও সংগঠনের প্রতি এখনো চাহিদা অনুযায়ী মনোযোগী নই। তাই অসংখ্য সুন্নী কচি কচি কোমলমতি নতুন প্রজন্মকে পড়ানোর জন্য গ্রামে গঞ্জে প্রয়োজনমত আমাদের কোন সুন্নী প্রতিষ্ঠান, সুন্নী আক্বীদাভিত্তিক ধর্মীয় গ্রন্থাদি লাইব্রেরী এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সুন্নী সংগঠন নেই বললেও চলে। আল্লামা ছৈয়দ রাহাত উল্লাহ শাহ্ (রহ:আ:)'র মত সুন্নীয়তের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে কোন সুন্নী আলেম বা সুন্নী সাধারণ শিক্ষিত যে কোন সুন্নী প্রতিষ্ঠান দিয়ে থাকলেও সুন্নী আলেমগণ কোন গ্রন্থাদি অনুবাদ বা লিখলে তা আমরা অর্থনৈতিক ও সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতে গিয়ে তা আমাদের সিলসিলার সম্পৃক্ত নয় এমন একটি অহেতুক বিরাট বাধা এসে যায়। এসব ভুল ধারনা পরিহার করে আলা হযরত, মুজাদ্দেদে দ্বীনো মিল্লাত, হুজুর ইমাম শেরে বাংলা (রহ:আ:)'র বাণী 'সুন্নীয়ত পীর ভিত্তিক নহে বরং পীর সুন্নী ভিত্তিক' একথা মতে সবাই আমরা নিম্নের বাস্তব স্লোগানের উপর একমত হয়ে চতুর্মূখী সুন্নীয়তের খেদমতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অনুরোধ রেখে অধমের ত্রুটিপূর্ণ অগোছালো লেখা এখানে শেষ করছি এবং আশা করছি আগামী "আলোকধারায়" সম্মানিত পাঠক মহলের জন্য ত্রুটিমুক্ত গোছালো সুন্দর লেখা পাব। আল্লাহ হাফেজ, আচ্ছালামু আলাইকুম।

' বাস্তব স্লোগান '

"বিশ্বে যার যার পীর ও তরীক্বা তার তার,
মসলকে আহলে সুন্নাতের অনুসারীরা এক কাতার"।
ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান এর ইন্তেকালে শোকবার্তা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান এর ইন্তেকালে মাইজভাণ্ডার শরীফ গাউসিয়া হক মনজিলের সাজ্জাদানশীন হযরত আলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.জি.আ.) গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির সততা, উদারতা ও ব্যক্তিগত চরিত্রের ভূয়শী প্রশংসা করে তিনি বলেন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ছিলেন দেশের অভিভাবক। তাঁর ইন্তেকালে দেশ একজন নিবেদিত প্রাণ দেশপ্রেমিক, মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন স্থপতি ও প্রবীণ প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদকে হারালো। তিনি মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

"পবিত্রতা এবং অজুর তাত্ত্বিক আলোচনা"

● শেখ আবুল বাসার ●

পবিত্রতা দু'প্রকারঃ জাহেরী পবিত্রতা, বাতেনী পবিত্রতা। শারীরিক পবিত্রতা ছাড়া যেমন সালাত হয় না- তদ্রুপ অন্তরের পবিত্রতা ছাড়াও আল্লাহ তাআলার মারিফাত অর্জিত হয় না। শারীরিক পবিত্রতার জন্য যেমন পানি আবশ্যক তেমনি অন্তরের পবিত্রতার জন্য "পাক তাওহীদ" আবশ্যক। নাপাক তাওহীদ নয়। অন্তরের পবিত্রতা অর্জনের জন্য হালাল খাদ্য আহার করা, সত্য কথা বলা, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় গোনাহ হতে পবিত্র থাকা, লোভ লালসা, মন্দ স্বভাব, হিংসা-দ্বেষ হতে পবিত্র থাকা ইত্যাদি পবিত্রতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। এই বিষয়ে এক বুযর্গ বলেছেন, "তাওহীদের মোকাম লাভ করা মাটির দেহের কাজ নহে। উহার স্থান পবিত্র আত্মা ও পবিত্র জীবনধারী ঐ সমস্ত লোক। অর্থাৎ মাশাইখে ইমামগণ যেমন সদা সর্বদা দৈহিক পরিচ্ছন্ন থাকেন তেমনি তাঁরা অন্তরের পবিত্রতা রক্ষা করে তাওহীদ দ্বারা নিজকে সজ্জিত রাখেন। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্তর পরিস্কার হবার জন্যই দোয়া করতেন, যেমন, "আল্লাহুম্মা তাহহীর ক্বালবি মিনান নিফাক।" "হে আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরকে নিফাক তথা কপটতা হতে পবিত্র রাখুন।" ইহা বাতেনী পবিত্রতার দিকেই ইঙ্গিত পূর্ণ বাণী। কেননা এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে আল্লাহর নবীর অন্তরে, নিফাকের ছাপ কখনো পড়তে পারে না। এই বাণীসমূহ ভক্ত সাহাবাদেরকে শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষকের কাজ।

হযরত ইয়াহইয়া মুনিরী (রহঃ) বলেন, "অধিক মুজাহাদা ব্যতীত মুরীদ মাকামে তাহারাত বা পবিত্রতা লাভ করতে পারে না। জাহেরী আদব রক্ষা করাই তাহারাতের মুজাহাদার শ্রেষ্ঠতম প্রকার, প্রত্যেক অবস্থায় যথা শক্তি জাহেরের উপর দৃঢ়পদ থাকা প্রয়োজন।" কেননা জাহেরের সাথে বাতেনের বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। হযরত ইবরাহীম খাওয়াস রহমাতুল্লাহে আলাইহে বলতেন, "আমি চিরদিন বেঁচে থাকার জন্য মহান আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি যাতে বেহেশতবাসী বেহেশতের নেয়ামত উপভোগ করে, আর আমি যেন দুনিয়ার বিপদ হতে মুক্ত থেকে শরীয়তের আদবের উপর দৃঢ়পদ থাকি। পরে এই বুযর্গ বাগদাদের জামে মসজিদে নির্জনতা অবলম্বন করলেন। মৃত্যুর পূর্বের রাত্রে তিনি ষাট বার গোসল করেন। এমনকি গোসল করার সময়ই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী রহমাতুল্লাহে আলাইহে সম্পর্কে বর্ণিত আছে মৃত্যু রোগের সময় তিনি ষাট বার গোসল করেন। এই গোসল করা অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হয়।

হযরত আবু ইয়াজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহে আলাইহে বলেন, মনে দুনিয়ার চিন্তা আসলে আমি অজু করি আর পরকালের চিন্তা মনে উদয় হলে গোসল করি কেননা দুনিয়া "মুহদেস" উহার সম্পর্কে ধারণা "হদস" পর্যন্ত পৌঁছে। আর হদসের পর অজু করা ওয়াজিব। সূত্রঃ- মকতুবাতে সাদী, ১ম খন্ড, ৩০ মকতুব,১৯২-৯৪ পৃঃ ১৯৮২ইং মুদ্রণ, মীর পাবলিকেশন, ঢাকা।

একদিন রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় সম্মুখ দিক থেকে আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হেঁটে আসছিলেন। হযরত রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার সাথে মুসাফাহা করার জন্য স্বীয় হস্ত তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু হযরত আবু হোরায়রা (রাদিঃ) নিজের হাত গুটিয়ে নিলেন। অতঃপর হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিস্মিত হয়ে বললেন, "কী ব্যাপার তুমি তোমার হাত গুটিয়ে নিলে কেন? উত্তরে তিনি বললেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপনি মহাপবিত্র, আপনার সর্বাঙ্গ পবিত্র। কিন্তু আমি কিছুক্ষণ পূর্বে আমার বিবির সাথে সহবাস করেছি অথচ গোসল করে পবিত্র হইনি। তাই এখন আমি অপবিত্র। অতএব অপবিত্র অবস্থায় কিভাবে আপনার পবিত্র হাতের সঙ্গে হাত মিলাব?" অতঃপর হুজুর পূরণুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, "মোমেন কখনও অপবিত্র হয় না। তার চলার গতি স্তিমিত হয়, সে খুঁড়িয়ে চলে, কিন্তু পথ চলা বন্ধ হয়ে যায় না অর্থাৎ সে নাপাক হয় না, এমন ব্যক্তির পান করা অবশিষ্ট পানি যে কেউ পান করতে পারে এতে কোন ক্ষতি হয় না।" সূত্রঃ- ফাওয়াএদুল ফাওয়াদ ১১০ পৃঃ মূল নিজাম উদ্দীন আওলিয়া- অনুবাদ কফিল উদ্দীন চিশতী, ২০০২ প্রকাশ।

হযরত আবু হোরায়রা (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হল, যখন আমি অপবিত্র ছিলাম। অতঃপর আমি নিজকে অপবিত্র মনে করে বাড়ি চলে গেলাম এবং গোসল সেরে নবী দোজাহান (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। ততক্ষণ তিনি আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাই সম্মুখে আসামাত্র আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হোরায়রা এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম, হুজুর! আমি অপবিত্র ছিলাম তাই আপনার সাথে বসা অপছন্দ করেছি। একথা শ্রবণে হুজুর পুরনুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, সোবহানাল্লাহ, "মোমেন" কখনও অপবিত্র হয় না। সূত্রঃ- হাদিস নং ২৭৯ বাংলা বোখারী শরীফ ৮৪ পৃঃ সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা। প্রকাশ-২০০৬ খ্রিঃ। বাংলা মুসলিম শরীফ ৭১০ নং হাদীস ১৮৪ পৃঃ ২০০৯ খ্রিঃ মুদ্রণ সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা। এই যদি পবিত্রতার হিসাব হয় তবে প্রচলিত পবিত্রতা থেকে আমরা কী শিখতে পারি? রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "মোমেন কখনও অপবিত্র হয় না।" এখন দেখতে হবে মোমেন কারা, মহান আল্লাহ তাআলার সেফাতী নাম সমূহের মধ্যে এক নাম মোমেন। অপরপক্ষে কুরআন পাকে আল্লাহতাআলা বলেন, "ওয়াআল্লাল্লাহা মা আল মুমিনিন।" আল্লাহ মোমেনদের সাথে থাকেন।" ৮:১৯ সুরা আনফাল। রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, "আনা মিনাল্লাহি ওয়াল মোমেনুনা মিন্নি।" "আমি আল্লাহ হতে এবং মোমেনগণ আমা হতে উদ্ভব।" এখানে দেখা যায় আল্লাহ পাক মোমেনদের সাথে থাকেন। মোমেন যদি অপবিত্র থাকে তবে আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে থাকতে পারেন না। কারণ, মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র, তাই অপবিত্রতার সাথে সংযোগ স্থাপন করেন না। এ জন্যই রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "মোমেনগণ আমা হতে।" এই সমস্ত কথার সমর্থনে বলা যায় প্রকৃত মোমেন কারা অথবা মোমেনের জাত পরিচয়। স্বজাতি বলেই রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "মোমেন কখনও অপবিত্র হয় না।" আল্লাহর জাতে জাত নবী দোজাহান এবং নবী দোজাহানের জাতে জাত সাহাবাকেরামগণ এবং অলি আউলিয়াগণ, মোমেনগণ যদি সদা সর্বদা পবিত্র থাকেন তবে বিশ্বঅলি শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)ও একজন মোমেন অলি আউলিয়া এবং ইনসানে কামেল এবং আওলাদে রাসূল এবং মওলা হুজুর সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ও আওলাদে রাসুল এবং রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর ৪১তম বংশধর। বর্তমান জামানায় এমন আলে রাসূলগণই সর্বদা পবিত্র থাকেন এবং সাধারণ মানুষ উনাদের কাছে যান পবিত্র হতে। পবিত্রতা অর্জন করার পর বায়াত নিয়ে বায়াতি মুসলমান হন।

মহান আল্লাহতাআলা কুরআন পাকে বলেন, "ওয়া ইন্নালাকুম ফিল আনআমে লায়েবরাতান নুছকীকুম মিম্মা ফী বুতুনেহী মিম্বাইনি ফারসীও ওয়া দামিল লাবানান খালিসান সায়েগাল্লিশ্বারিবীনা।" এবং নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য অবশ্যই চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, আমরা তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তু গোবর ও রক্তের মধ্য হতে খাঁটী দুধ যা পানকারীদের জন্য অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক। নহল-১৬:৬৬।

সম্ভবতঃ এই আয়াতে কারিমায় আল্লাহতাআলা ইঙ্গিত করেছেন। "তোমরা সর্বতোভাবে পবিত্র হয়ে আমার কাছে আস তখন অবশ্য গ্রহণীয় হবে।" জনৈক বুযর্গ বলেন, "তাদের মধ্যে বেহেশত দোযখের কোন চিন্তা নেই, তাদের খামিরের মধ্যে এই উপকরণই রাখা হয়েছে।"

অধিক মুজাহাদা ব্যতীত মুরীদ কখনও মাকামে তাহারাত বা পবিত্রতা লাভ করতে পারে না। জাহেরী আদব রক্ষা করাই তাহারাতে মুজাহাদার শ্রেষ্ঠতম প্রকার, প্রত্যেক অবস্থায় যথাশক্তি জাহেরের উপর দৃঢ় পদে অবস্থান মজবুত করে থাকতে হবে। তবে মূল কথা এ হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলাভে যাঁরা কৃতকার্য হয়েছেন তাঁদের একমুহূর্তও আল্লাহ পাকের ধ্যান ধারণা হতে ফিরে থাকার সুযোগ নেই। ক্ষণকালের জন্য তাঁদের অমনোযোগী হওয়া সাধারণ লোকের সারা জীবন অমনোযোগী হওয়ার সমান। মোট কথা জ্ঞানী বুযর্গগণ জাহের বাতেন সর্বদা পবিত্র থাকার জন্য খুব তাকীদ করেছেন। কারণ তাঁরা জানতেন যে পবিত্রতা সকল কাজের মূল। তরীকতের নীতি এটাই যে এতে অন্তর বা কলব আয়নার ন্যায় পরিস্কার থাকবে। যার ফলে দুনিয়া ও পরকালের প্রতিবিম্ব কলবের উপর পতিত হতে না পারে। শুধুই মুরশীদের চেহারা মুবারক কলবে প্রতিবিম্ব রূপে দেখা যেতে পারে। অন্যছবি প্রতিফলিত হওয়া মানে গায়রুল্লাহর ছবি থাকা। মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার চলার পথে বেহেশত ও দোযখের

খেয়াল থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি রহস্যলোকের সন্ধান পাবে না। যখনই তুমি এই দুই এর খেয়াল পরিত্যাগ করবে তখনই রাতের অন্ধকারেও ভোরের উজ্জ্বলতা দেখতে পাবে।"

অবশ্য পবিত্রতার শর্ত পুরণের জন্য পানি দ্বারা অজু গোসল করে শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করা যায় পবিত্রও হয়। এবং পাক পবিত্র হওয়া সালাতের জন্য শর্তও আছে। অবশ্য পানির অভাবে তায়াম্মুম নামক বিধান দেওয়া হয়েছে। মানুষের বিপদ মুহূর্তে উপকারার্থে মাটি অথবা বালি ব্যবহারের মাধ্যমে। যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন, "ফালাম তাজেদু মা-আন ফাতাইয়াম মামু সায়ীদান তাইয়্যেবান ফামসাহু বে উজুহেকুম ওয়া আইদীকুম।" "সুতরাং যদি পানি না পাওয়া যায়, সুতরাং তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে, সুতরাং তোমরা তোমাদের মুখমন্ডলকে এবং হাতগুলোকে মাসেহ করবে।" ৪:৪৩-নিসা। তবে বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য অজু এবং গোসলের মাধ্যমে যেই পদ্ধতির কথা জানা যায় তেমন পদ্ধতি তায়াম্মুমে দেয়া হয়নি। তায়াম্মুমে বালি/মাটি দ্বারা মুখমন্ডল এবং দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার বিধান দেয়া হয়েছে। অন্য কোন অঙ্গ মাসেহ করার বিধান তায়াম্মুমের জন্য প্রযোজ্য নয়। যদিও প্রশ্ন করতে ভয় হয় যে, অজু গোসলের জন্য এত নিয়ম বিধান আর তায়াম্মুমের জন্য তেমন খুব বেশী নিয়ম কানুন নেই, তবে আর সমস্ত শরীর তায়াম্মুমের মাধ্যমে পাক পবিত্র হয় কী করে? অথবা ভিতরের কলুষতা হতে পবিত্রতা অর্জন হতে পারে কেমন করে? মহান আল্লাহ তাআলার এই তো বিধান যে কোন এক মাধ্যমে মানুষকে নিজের করে নেয়া পবিত্রতার বাহনায়।

রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, চারটি দোষ যার ভিতর আছে সে মোনাফেক, যদিও সে সালাত আদায় করে, রোজা রাখে এবং ভাবে সে মোমেন (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, (২) যখন সে ওয়াদা করে তা রক্ষা করে না (৩) যখন তাকে বিশ্বাস করা হয় সে তা ভঙ্গ করে, (৪) যখন সে বিবাদ করে তখন অনর্থক বকাবকি করে। (বোখারী, মোসলিম)। হযরত রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আরও বলেন, ধর্মের ভিত্তি পবিত্রতার উপর স্থাপিত (তিবরানী)। তিনি আরও বলেন, পবিত্রতাই সালাতের কুঞ্জি। তিনি আরও বলেন, "তাদের ভিতর এমন অনেক লোক আছে যারা পবিত্র থাকতে ভালবাসে এবং মহান আল্লাহতাআলা পবিত্র লোকদিগকে ভালবাসেন।" তিনি বলেন "পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক"। মহান আল্লাহতাআলা বলেন, "ধর্মের ভিতর আল্লাহতাআলা তোমাদের উপর কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা করেন না। কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পবিত্র করতে ইচ্ছা করেন।" অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন লোক এই সকল প্রকাশ্য কথা দ্বারা বুঝে যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল অন্তরকে পবিত্র করা। অপর দিকে পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক। এই হাদিসের উদ্দেশ্য যদি বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেই পানির দ্বারা ধৌত করার অর্থ হয় এবং অন্তরকে পবিত্র করার অর্থ না হয় এবং তাতে মন্দ চিন্তা পোষণ করা হয় তা হলে ইহার অর্থ সুদুরবর্তী। তা কখনও হতে পারে না। পবিত্রতার ভিতর চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যথা-(১) প্রকাশ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অপবিত্রতা ও নাপাকী হতে পবিত্র করা। (২) অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে গোনাহের দোষত্রুটি হতে মুক্ত করা। (৩) মন্দ স্বভাব এবং নিন্দনীয় অভ্যাস হতে মনকে পবিত্র করা। (৪) আল্লাহ ব্যতীত অন্য জিনিষ হতে মনকে পবিত্র করা । ইহাও নবীদের এবং হিদ্দিকদের পবিত্রতা। পবিত্রতার প্রত্যেক বিষয়ই আমলের অর্ধেক। কেননা বাতেনী কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য আল্লাহর গৌরব ও মহত্ব প্রকাশ করা। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহতাআলার মারিফাত অর্জন হয় না যে পর্যন্ত দেলকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য জিনিষ হতে পবিত্র করা না হয়। কেননা একই দেলের ভিতর দু'টি একক বিশ্বাস থাকতে পারে না। মহান আল্লাহতাআলা কোন মানুষের ভিতর দুটি দেল বা কুলব দেননি বা সৃষ্টি করেননি। দেলের আমলের পরোক্ষ উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় গুণাবলীর দ্বারা এবং শরীয়তে ধর্ম বিশ্বাসের দ্বারা তাকে মজবুত করা। ইহা প্রকাশ যে দেল ঐ সকল গুণের দ্বারা যে পর্যন্ত গুণান্বিত হবে না ততক্ষণ দেলের ভিতর মন্দ দোষাবলী ও ফাছেক ধর্ম বিশ্বাস থাকে। এই সকল দোষ হতে অন্তরকে পবিত্র করাই দুই অর্ধেকের এক অর্ধেক এবং তাই প্রথম অর্ধেক দ্বিতীয় অর্ধেকের শর্ত। এই অর্থেই পবিত্রতাকে ইমানের অর্ধেক বলা হয়।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নিষিদ্ধ কার্যাবলী হতে পবিত্র করা এক অর্ধেক। এটাই প্রথম অংশ এবং ধর্মকর্মের দ্বারা তাকে পোক্ত করা দ্বিতীয় অংশ। এ সকলই ইমানের ঘাটি এবং প্রত্যেক ঘাটিতেই এক একটি দরজা আছে। কোন বান্দা নীচের দরজা অতিক্রম না করে তার উপরের দরজা অতিক্রম করতে পারে না। সে যে পর্যন্ত মন্দ দোষগুলো হতে অন্তরকে পবিত্র না করবে এবং সৎ গুণাবলী দ্বারা

তাকে মজবুত না করবে সেই পর্যন্ত সে প্রকৃত পবিত্রতায় পৌঁছতে পারবে না। উদ্দেশ্য যতই সম্মান জনক হবে ততই তার পথ দুর্গম এবং দীর্ঘ হবে। বাহ্যিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় প্রচুর পানির অন্বেষণে শয়তানের কুমন্ত্রণার কারণে সমস্ত সময় নষ্ট করে বিকৃত বুদ্ধির কারণে সে ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করে যে সম্মানজনক পবিত্রতা শুধু এই বাহ্যিক পবিত্রতার মধ্যে নিহিত। অথচ প্রাথমিক মুসলমানদের স্বভাব চরিত্র এবং তাদের চিন্তা ও পরিশ্রম শুধু অন্তরের পবিত্রতার মধ্যে ছিল এবং প্রকাশ্য পবিত্রতায় তারা শিথিল ছিল। এমনকি খলিফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এত উচ্চ পদে সমাসীন থাকা সত্ত্বেও তিনি খ্রিষ্টান এক স্ত্রীলোকের পাত্র হতে পানি নিয়ে অজু করে ছিলেন, সাহাবীগণ সময় সময় খাওয়ার পর চর্বি মিশ্রিত হাত ধুইতে পারতেন না, বরং তাদের অঙ্গুলী সমূহ পায়ের তলায় মুছে নিতেন। সাবান ব্যবহারকে তাঁরা বেদায়াত মনে করতেন। তাঁরা মসজিদের ভিতর মাটির উপর সালাত আদায় করতেন এবং নগ্ন পদে পথে বিচরণ করতেন। তাঁদের শরীর ও মাটির মধ্যবর্তী আর কোন বিছানা ছিল না, তাঁরা বড় বড় বুজার্গ সাহাবী ছিলেন।

কথিত আছে যে, রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর পর প্রথমেই যে বেদায়াত আরম্ভ হয়েছিল তার সংখ্যা চারটি। (১) চালুনী, (২) সাবান (৩) লম্বর খান (৪) তৃপ্তিসহকারে ভক্ষণ করা। তাদের ভিতর কাউকেই কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহ্যিক নাপাকীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে কখনও শুনা যেত না। এখনতো এই রকম পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে যে বাহ্যিক ইস্ত্রী করা কাপড়ের নাম পবিত্রতা রাখা হয়েছে। অন্তরে এবং মনে যত অপবিত্রতাই থাকুক না কেন। অনেকেই বলে যে এটাই ধর্মের মূল ভিত্তি। এক দলের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় দুল হানের কেশরাজী বিন্যাস করার ন্যায় বাহ্যিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে। কিন্তু তাদের অন্তর অসৎ চিন্তা, অহংকার, আত্মাভিমান, মূর্খতা, রীয়া এবং মোনাফেকীতে পরিপূর্ণ। লোকের দেল যদি পবিত্র না হয় তা হলে আল্লাহর নিকট শরমিন্দা থাকবে। কুলবই আল্লাহ তাআলার দৃষ্টির স্থান। প্রকৃত পক্ষে জানতে হবে যে, তাওবা করা, মন্দ স্বভাব হতে দেলকে মুক্ত করা এবং সৎ স্বভাবের দ্বারা তাকে সুশোভিত করার পবিত্রতাই অধিকতর উত্তম। যে ব্যক্তি প্রকাশ্য পবিত্রতাকে যথেষ্ট মনে করে তার দৃষ্টান্ত এইরূপ। "এক ব্যক্তি কোন বাদশাহকে নিজের ঘরে দাওয়াত দিল। অতঃপর ঘর বিভিন্ন মালামাল দ্বারা পূর্ণ করে এবং দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা আবর্জনা দিয়ে ঘর ভর্তি করে একদিকে একটু জায়গা খালি রাখল। যেখানে বাদশাহর জন্য সুন্দর মূল্যবান কুরসী মখমলের গালিচার উপর সাজিয়ে রাখল। অতঃপর ঘরের সামনের ভাগে খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সুন্দর ফুলের টব দ্বারা আরও মুগ্ধকর পরিবেশ তৈরী করল। বাহিরে আরও সুন্দর রং দ্বারা চিত্রাঙ্কন করে আরও সুন্দর পরিবেশ তৈরী করল। যখন বাদশাহ মহোদয় ঐ ব্যক্তির বাড়ী এসে সামনে সুন্দর মনোরম দৃশ্য দেখে খুবই খুশী হলেন। অতঃপর বাদশা মহোদয় যখন ঘরের ভিতর ঢুকে ভিতরে দুর্গন্ধময় পরিবেশে ময়লার পাশে বাদশাহর আসন দেখতে পেলেন তখন বাদশাহ ক্ষুব্ধ হয়ে আমন্ত্রণকারী ব্যক্তির প্রতি রাগ করে ঘর হতে বের হয়ে চলে গেলেন।" সূত্রঃ- এহ্ ইয়াও উলুমিদ্দীন ১ম খন্ড ২২৩-২৪৯ পৃঃ অনুঃ মাওলানা ফজলুল করিম-১৯৬৭ইং প্রকাশঃ ইসলাম মিশন লাইব্রেরী, ঢাকা।

এ জন্য এক বিলগ্ধ কবি বলেন,

হাত পা ধুয়ে ঢুকে গেল। তাই বলে কি অজু হল।
মনের আঁধার মনে রইল, বাহিরে করিলে পরিষ্কার।।
কলবেতে কুকুরের ছবি নিয়ে, হিসাবি সালাত করবি কতকাল?

অন্য এক কবি বলেন,

মনের মুর্তি ভাঙ্গার পন্ডশ্রমে, ব্যয় হয়েছে অনেক সময়।
সম্মুখ পানে চলতে গিয়ে কঠিন সময় সামনে আমার।।

হে শেখ আবুল বাসার! তুমিও সেই প্রেমিকদের দলের সাথী যারা মওলা হুজুর সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভান্ডারী মান্দাজিল্লুহুল আলী এর আশেক প্রেমিক। তারা তো তীর্থ যাত্রীর দল যাদের নেতা হলেন, বিশ্ব অলি শাহান শাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী কদ্দসুল্লাহুল সিররুলবারী - যিনি আমার কলুষতাপূর্ণ মাটির দেহকে পুড়িয়ে খাঁটি স্বর্ণে পরিণত করবেন আমার মন থেকে কু-স্বভাব কু-রিপু দূরীভূত করবেন। আমার দেহ মন পুরাতন ধ্যান ধারণা সকলই দরবারের সামনে মাথা কুটে আত্মাহুতি দিয়ে এবং আমার মূল আমিত্বকে বিকিয়ে দিয়েছি। আমিন। সুম্মা আমিন, বেহুরমতে রাব্বীল আলামীন।

সম্পদ ও ক্ষমতার দায়

● মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ●

৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরবের মরু বুকে হযরত রসূলে করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাব ও ৭ম শতাব্দীতে পবিত্র কুরআনের অবতরণ পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। পবিত্র কুরআন জীবন ও জগত সম্পর্কে মানুষের চিন্তার জগতে এক অভিনব বিপ্লব সাধন করেছে। এ গ্রন্থের আবেদন, ভাষাশৈলী, বক্তব্য, নির্দেশ, তথ্য উপস্থাপন, হুঁশিয়ারী সরাসরি মানুষের মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আপন সত্যতা, দৃঢ়তা ও মহিমা সম্পর্কে কুরআনের আত্ম প্রত্যয় কিংবদন্তী তুল্য। নিজের মধ্যে সন্দেহ সংশয়ের লেশমাত্র নেই এমন ঘোষণা দেয়ার স্পর্ধা একমাত্র কুরআনই রাখে। পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন, শাশ্বত ও সর্ব সাম্প্রতিক অভিপ্রায়কে মানবজাতির সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

কুরআনের সত্যতাকে সন্দেহ করে যাঁরা বিপরীত ভূমিকা অবলম্বন করার প্রয়াস পেয়েছেন তাঁরাই কুরআনের চ্যালেঞ্জের সামনে নতিস্বীকার করে মুগ্ধ চিত্তে আত্ম সমর্পন করতে বাধ্য হয়েছেন। কুরআন অজ্ঞানতার আবরণ সরিয়ে মানুষের মনে আলোর প্রস্রবণ জারী করে দেয়। দিশাহারা মানুষকে দেয় পথের সন্ধান। যে চলতে চায় তাকে দেয় চলার শক্তি। কুরআন মূর্খকে জ্ঞানী বানায়, বেঈমানকে ঈমানদার বানায়, অলসকে করে আশাবাদী। কুরআন ভীরুকে যোগায় সাহস, দোদুল্যমানকে দেয় দৃঢ়তা, অস্থিরকে দেয় স্থিরতা, চঞ্চলকে দেয় ধীরতা।

কুরআন মানুষের দৃষ্টির সংকীর্ণতাকে প্রসারিত করে দেয়। কারণ কুরআন এমন এক জানালা যার ভেতর দিয়ে পরকালের দৃশ্য দেখা যায়। বস্তুবাদী মানুষ মনে করে মানুষের জীবন জন্ম ও মৃত্যু এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ তা জন্মতে শুরু ও মৃত্যুতে শেষ। কিন্তু কুরআন শিক্ষা দেয় মৃত্যুতে জীবনের শেষ নয়। বরং মৃত্যু হচ্ছে অনন্ত জীবনের উদ্বোধনকারী এক প্রাকৃতিক ঘটনা। কবর সে অমর জীবনের দুয়ার মাত্র। ইসলামের পরিভাষায় মৃত্যুকে বলা হয় ইনতিকাল। এর অর্থ হচ্ছে স্থান পরিবর্তন। এক জীবন ছেড়ে অন্য জীবনে প্রবেশ করা। আমরা মায়ের পেটের অতি সঙ্কীর্ণ স্থান ছেড়ে বৃহত্তর পৃথিবীর সুবিস্তৃত পরিসরে ভূমিষ্ঠ হই। আর মৃত্যুর মাধ্যমে সেই সুপরিসর পৃথিবীর পেট থেকে বেরিয়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করি এক অকল্পনীয় পরিসর সম্পন্ন পরকাল জগতে। মায়ের পেটে থেকে মানব শিশু যেমন সুবিস্তৃত এ পৃথিবীর বিশালতাকে কল্পনাতেও ধারণ করতে পারেনা একই ভাবে এ পৃথিবীর তুলনায় পরজগতের বিশালতাকেও উপলব্ধি করতে পারে না।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা মহা বিশ্বে এমন এক বৃহৎ কাঠামো আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন যাকে মনে করা হচ্ছে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত কাঠামোর মধ্যে বৃহত্তম। এটি আধা নাক্ষত্রিক বস্তু বা কোয়াসার গুচ্ছ দিয়ে তৈরি। এর এক পাশ থেকে অন্যপাশ যেতে কোন মহাকাশযানের আলোর গতিতে চললেও সময় লাগবে চারশ' কোটি বছর। জ্যোতির্বিদদের মতে এটি একটি বৃহৎ কোয়াসার গ্রুপ (এল কিউ জি)। কোয়াসার এক ধরণের ছায়াপথ, যা মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরু থেকে বিদ্যমান।

সৌরজগতে আমাদের ছায়াপথ মিল্কিওয়ে থেকে তার নিকট প্রতিবেশি আন্দ্রোমিদা ছায়াপথের দূরত্ব প্রায় ২৫ লাখ আলোক বর্ষ। এ ছায়াপথ গুচ্ছকে অতিক্রম করতে মহাকাশ যানের ৬০ লক্ষ থেকে ১ কোটি আলোকবর্ষ সময় লাগে। কিন্তু উল্লিখিত নূতন আবিষ্কৃত এল কিউ জির এক ছায়াপথ থেকে আরেক ছায়াপথে যেতে ৬৫ কোটি আলোকবর্ষ সময় দরকার হবে।

সম্প্রতি পিএইচ ওয়ান নামে একটা গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে যার রয়েছে চারটি সূর্য। গ্রহটি পৃথিবী থেকে ৫ হাজার আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত।

এ সমস্ত বিস্ময়কর আবিষ্কার মহান রব্বুল আলামীনের অপার মহিমাকেই নির্দেশ করে। মানুষ যদি আসমান জমিন ছেড়ে এর বাইরে চলে যেতে পারে তবে সর্বত্র সে আল্লাহর মহিমাকেই প্রত্যক্ষ করবে। মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামের ৫৫নং সূরা আর রাহমানে আপন মহিমার কতিপয় অভিনব ও চমকপ্রদ নিদর্শন ও নিয়ামতের বর্ণনা দিয়ে জ্বীন ও মানব জাতির উদ্দেশ্যে ৩১ বার প্রশ্ন করেছেন: তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? বোদ্ধা মানুষের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত আছে। অর্থাৎ মানুষ ও জ্বীনের পক্ষে আল্লাহর কোন নিয়ামতকেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে: (বঙ্গানুবাদ) **"আকাশ মন্ডল**

ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য, যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহর স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদের জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর।" (সূরা বাকারা, ১৯০-১৯১)

মহান আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত দু'টোর মাঝে বিশ্বের তাবত ধ্যানী জ্ঞানী বোদ্ধা বিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবী চিন্তাশীল বিবেকবান ইতিবাচক মানুষকে সামিল করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য অবলোকন করলে কোন মানুষই আল্লাহর সপ্রশংস তসবীহ উচ্চারণ না করে থাকতে পারে না। নিজের অজান্তে ও স্বতস্ফুর্তভাবে মহান স্রষ্টার কুদরতের কাছে সে তখন নিজেকে অতি তুচ্ছই মনে করে। জীবনের অধিকাংশ সময় হেলা ফেলা অবহেলায় কাটিয়ে দেয়ায় নিজের পরিণতি সম্পর্কে সে তখন হয়ে পড়ে বেচঈন ব্যাকুল। সিজদায় সমর্পিত হয়ে সে তখন আত্মরক্ষায় আর্তনাদ করে ওঠে। বলে, 'হে প্রভু তুমি আমাকে দোযখের আগুন হতে রক্ষা কর।' কারণ আল কুরআনই মানুষকে জানিয়ে দিয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য তিনি আগুনের লেলিহান শিখা প্রস্তুত রেখেছেন যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।

মানুষের জীবনই হল আশা ও ভয়ের দোলাচলে দোলুল্যমান। ভয় যদি জীবনের অনুষঙ্গ না হত তাহলে মানুষ হয়ে পড়ত বাধাবন্ধনহীন বেপরোয়া আর আশা যদি না যোগাত জীবনের প্রাণরস তাহলে তারা হয়ে পড়ত হতমান ম্রিয়মান। এতে পৃথিবীতে মানুষের আগমণের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। মানুষ পৃথিবীকে ফুলে ফলে আবাদ করে মানবিকতার চরম উৎকর্ষ সাধন করবে জীবন ও প্রকৃতির দাবী এটাই। মানবিকতার বিকাশ সাধন করে স্রষ্টার মহিমাকে উর্ধে তুলে ধরবে মানুষ এ জন্য পৃথিবীকে এত রঙে রসে রূপে বৈচিত্রে সৃষ্টি করা হয়েছে।

কিন্তু মানুষ এখন পৃথিবীকে আবাদ করার পরিবর্তে যেন একে বরবাদ করার সাধনায় মেতে ওঠেছে। মানবিকতার সর্বোত্তম বিকাশের পরিবর্তে দানবিকতার প্রকাশ ঘটানোর প্রতিযোগিতায় হয়েছে লিপ্ত। মানবজাতি বিভক্ত হয়ে পড়েছে নানা বিবাদমান গোত্রে। একই সীমান্ত রেখার অভ্যন্তরের মানুষও পার্থিব স্বার্থের লালসায় নানা দল উপদলে বিভক্ত। সবক্ষেত্রে সবলরাই দুর্বলের ওপর প্রভুত্ব কায়েম করে চলেছে। অথচ প্রভুত্ব নয় ভ্রাতৃত্ব কায়েমের জন্য তারা আদিষ্ট ও আবির্ভূত।

মানুষের মাঝে সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সারা বিশ্বে তারা ছড়িয়ে দিয়েছে বৈষম্য ও জুলুম। স্থানীয় সন্ত্রাস দমনের নামে তারা সৃষ্টি করেছে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস। যে সম্পদ তারা ব্যয় করতে পারত দারিদ্র দূরীকরণে তা তারা বিপুল উৎসাহে অপচয় করছে অধিকার কামী জনগোষ্ঠীর নির্যাতনে। রাষ্ট্রীয় শক্তিকে জন কল্যাণে প্রয়োগ না করে জন দুর্ভোগ সৃজনে অপব্যয় করা হয়েছে। সম্পদের সুষম বন্টনে নিয়োজিত না থেকে অনটনের বন্টনে তারা পারঙ্গমতা দেখিয়েছে বেশি।

যদিও মানুষ চন্দ্র বিজয় করেছে ও মঙ্গলে বসবাসের আয়োজন করছে তথাপি সে জমিনেই অনেক আদম সন্তানকে ক্ষুধায় কাতর করে রাখছে। খোদ আমেরিকায় অনেক মার্কিনী আছে যারা ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করে। ওয়ালমার্টের (বিখ্যাত চেইন শপ) সামনে ঘন্টা বাজিয়ে তারা ভিক্ষা করে। তাদেরকে বলা হয় White Trash (সাদা বর্জ্য)। স্থানীয় নিগ্রোদের অবস্থা আরো শোচনীয়। এক তথ্যে জানা গেছে আমেরিকায় গৃহহীন মানুষের সংখ্যা ৩৫ লাখ। অথচ এখানে খালি বাড়ির সংখ্যা ১ কোটি ৮৬ লাখ। অসম ধনবন্টনের কারণে এ রূপ প্রকট ধন বৈষম্য ও বীভৎস পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। এক তথ্য মতে ২০০৭ সালে আমেরিকায় সর্বোচ্চ ১% মানুষের ভোগ দখলে আছে ৩৫% রাষ্ট্রীয় সম্পদ। পরবর্তী ১৯% মানুষ ভোগ করছে ৫০% রাষ্ট্রীয় সম্পদ। অর্থাৎ মাত্র ২০% মানুষের কুক্ষীগত আছে দেশের ৮৫% সম্পদ। বাকী ৮০% অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য বরাদ্দ আছে মাত্র ১৫% সম্পদ। এতে সাধারণ মানুষের জীবন যাপন কতটুকু কষ্টকর তা সহজেই অনুমেয়।

অথচ এর বিপরীত দেখা যাচ্ছে আমেরিকারই মানুষ মঙ্গল গ্রহে বসবাসের পরিকল্পনা করছে। 'স্পেস এক্স' এর কর্ণধার এলন মাস্ক মঙ্গলের মাটিতে ৮০ হাজার মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি শহর নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এজন্য মঙ্গল গ্রহে বসবাসে ইচ্ছুক প্রতিটি মানুষকে ব্যয় করতে হবে ৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ৩ হাজার ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার। শুধু এ টাকা খরচ করার যোগ্যতা নয় নির্বাচিত ব্যক্তিকে ৮ বছর প্রশিক্ষণও নিতে হবে। এতেও ব্যয় হবে বিপুল পরিমাণ টাকা। এত অপরিমেয় ডলার খরচ করার সামর্থের পাশাপাশি একই পৃথিবীতে বিরাজ করছে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার ন্যূনতম সক্ষমতা বিহীন অসংখ্য মানুষ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অবস্থাও প্রায় একই। একদিকে অপরিমিত বৈভব অন্যদিকে দুঃসহ দারিদ্র।

জানা গেছে ২০১৩ সালে আমাদের প্রতিবেশী ভারত মহাকাশে ১০টি উপগ্রহ পাঠানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী (২০১৩) পি এস এলভি-সি-২০ নামক উপগ্রহটি উৎক্ষেপন করা হয়েছে। ঘোষিত ১০ টি উপগ্রহের মধ্যে এটি প্রথম। তবে ভারতের ইতিপূর্বে উৎক্ষিপ্ত উপগ্রহের মধ্যে এটি ২৩ তম। উপগ্রহটি সাত তলা লম্বা ও এটির ওজন ২০০টন। অথচ এদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কম নয়। এখানে তফসীলি উপজাতীয়দের মধ্যে ৪৭ শতাংশ এবং সাধারণ তফসীলি সম্প্রদায়ের মধ্যে ৪২ শতাংশ দারিদ্র বিরাজ করছে। এ তথ্য জানিয়েছেন ইউ এন ডি পির (জাতি সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠান) কান্ট্রি ডিরেক্টর কেইটলিন ওয়াইসেল। জাতিসংঘের এ কর্মকর্তা বলেছেন ধর্মীয় জনসংখ্যানুপাতে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, গুজরাট এবং উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের মধ্যে চরম দারিদ্র বিরাজ করছে। কৃষি শ্রমিকদের ৫০ শতাংশ এবং অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে ৪০ শতাংশ এখনো দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছেন।

এ ধরণের ভারসাম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিশ্ব শান্তির জন্য কখনো অনুকূল নয়। মানবজাতির দায়িত্ব হয়ে পড়েছে প্রতিকূল এ অবস্থাকে অনুকূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করা। পবিত্র কুরআন অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এ ক্ষেত্রেও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন নিজেদের ধনবন্টন ব্যবস্থা এমন না করে যাতে সম্পদ গুটিকয় ব্যক্তির মাঝে আবর্তিত হতে থাকে। স্মরণ রাখতে হবে, ধনীদের সম্পদে মানব জাতির প্রতিটি বঞ্চিত ও দুঃস্থ মানুষের অধিকার রয়েছে। মানুষকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে কুরআন মোটেই ভুল করেনি।

২০১২ সালের সেরা ধনী কার্লোস স্লিম (সম্পদের পরিমাণ ৬ হাজার ৯০০ কোটি ডলার) ও ২য় সেরা ধনী বিল গেটস (সম্পদের পরিমাণ ৬ হাজার ১০০ কোটি ডলার) সহ বিশ্বের সকল ধনীদের উচিত কুরআনের এ আহ্বানের প্রতি সাড়া দেয়া।

সম্পদ যেমন মানুষের কল্যাণে ব্যয়িত হওয়া প্রয়োজন, তেমনি রাজনৈতিক ক্ষমতাও ব্যবহৃত হওয়া উচিত মানুষের মাঝে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠায়। অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ছাড়া ক্ষমতার অন্যত্র বা অন্য রকম ব্যবহার অপব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যই মানুষকে কল্যাণমূখীতায় নিয়োজিত করে ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে রক্ষা করে। সমাজে, পৃথিবীতে, মানুষের মাঝে আইনগত সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ছাড়া ক্ষমতার সপক্ষে পেশ করার মত একটা যুক্তিও মানুষের হাতে অবশিষ্ট থাকবে না।

পৃথিবীতে একটি ভীতিহীন প্রীতিময় সমাজ গড়ে তোলাই কুরআনের অন্যতম দাবি। আমরা জানিনা পৃথিবীর সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী মানুষেরা কুরআনের এ দাবিকে বিবেচনায় নেবে কিনা।

সূফি উদ্ধৃতি

■ তিনটি কাজ মানুষের বড় বিপদ ডেকে আনে, যথাঃ ১. সম্পদের লোভ, ২. মান ও যশের আকাঙ্ক্ষা এবং ৩.সবার নিকট গ্রহণীয় ও আকর্ষণীয় হওয়ার বাসনা।

■ পার্থিব আমোদ উৎসব আল্লাহকে খুশী রাখার চিন্তাকে মন থেকে দূর করে দেয়।

■ আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার ভয় ও তাঁর রহমতের আশা অন্তরে বিরাজমান থাকাই ঈমানের লক্ষণ।

– হযরত আবু ওসমান হীরী (রাহ্)

■ তোমাদের উচিত সাধারণ বিছানায় শয়ন করা ও আমোদ-প্রমোদ বর্জন করা।

■ আরিফদের কাছে এক বিশেষ আয়না রয়েছে যখন তিনি তার দিকে নজর করেন তখন তাতে আল্লাহ তা'আলা এসে দেখা দেন।

■ খুশী ও আনন্দিত মনে আল্লাহর নির্দেশকে মেনে নেয়াই হয় সেবা।

হযরত ফোদায়েল আয়াজ (রাদ্বি.)'র সাথে খলিফা হারুন-অর রশীদ এর সাক্ষাৎকার

● অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান ●

হযরত ফোদায়েল আয়াজ (রাদ্বি.) ছিলেন ৯ম শতাব্দীর একজন অন্যতম সূফি ব্যক্তিত্ব। তৎকালীন খলিফা হারুন-অর রশীদ এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়া এবং তাঁদের মধ্যে কথোপকথন ও রহস্যময় ঘটনার অবতারণা সম্পর্কিত বেশ কিছু বিস্ময়কর কাহিনী রয়েছে। তার সামান্য অংশ এ নিবন্ধে উপস্থাপন করছি। খলিফা হারুন-অর রশীদ একদিন তাঁর মন্ত্রীকে বললেন যে তাঁকে যেন একজন আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদানকারী ব্যক্তির নিকট নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে গেলে তাঁর আত্মার প্রশান্তি ঘটবে এবং সমস্যা দূরীভূত হবে। খলিফার ইচ্ছানুযায়ী মন্ত্রী খলিফাকে হযরত ফোদায়েল (রাদ্বি.) এর নিকট নিয়ে গেলেন। যখন খলিফা তাঁর মন্ত্রী এবং দেহরক্ষীগণসহ হযরত ফোদায়েল (রাদ্বি.) এর ঘরের দরজায় গিয়ে তাঁকে ডাকলেন, হযরত ফোদায়েল (রাদ্বি.) ঘরের ভিতর হতে আওয়াজ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "খলিফার সাথে আমার কী কাজ? তিনি কি আমাকে তাঁর সাথে জড়িয়ে আমার আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চান?" মন্ত্রী জবাব দিলেন "আপনাকে অবশ্যই খলিফার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। আপনি আমাদেরকে আপনার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দিবেন নাকি আমরা ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঢুকব?" হযরত ফোদায়েল (রাদ্বি.) উত্তর দিলেন, "আমাকে হুমকী ধমকী তথা শাসন করার চেষ্টা করবেন না। আমর নিকট যে কেউ কিছু জানতে চাইলে সে যেই হউকনা কেন তাঁর জন্য আমার ঘরের দরজা সব সময় উন্মুক্ত"। খলিফা এবং তাঁর সভাসদকে হযরত ফোদায়েল (রাদ্বি.) এর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হল। যে মাত্র তাঁরা গৃহে প্রবেশ করলেন হযরত ফোদায়েল (রাদ্বি.) যেন খলিফার চেহারা না দেখেন সেজন্য তিনি ঘরের বাতিটা নিভিয়ে দিলেন। অতঃপর গভীর ধ্যানমগ্নতায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর যখন হযরত ফোদায়েল (রাদ্বি.) তাঁর মোরাকাবা মোশাহেদা ও মুনাজাত শেষ করলেন খলিফা তার নিকট কিছু উপদেশ বাণী প্রার্থনা করলেন। হযরত ফোদায়েল (রাদ্বি.) বললেন, "একদা আপনার পিতা নবীজী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একটি প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন পেশ করলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন আমি তোমাকে তোমার নিজের নফসের তথা প্রবৃত্তির উপর গভর্ণর নিযুক্ত করেছি। অর্থাৎ নিজের নফসের নিয়ন্ত্রক করেছি" হাজার বছর বহু মানুষকে শাসন কিংবা নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে নিজের নফস বা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজ।"

খলিফা হারুন-অর-রশীদ এ বক্তব্য শুনে অবাক হলেন এবং আরো উপদেশবাণী শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। খলিফাকে হযরত ফোদায়েল(রাদ্বি.) বলতে লাগলেন, "বৃদ্ধ লোককে নিজ পিতার মত শ্রদ্ধা করবেন, যুবক যুবতীদের সাথে নিজের ছেলে-মেয়ে ও ভাই বোনের মত আচরণ করবেন, আল্লাহকে ভয় করুন কারণ আল্লাহ্ মানুষের প্রতি আপনার ন্যায়পরায়ণতা এবং উদারতা নিয়ে কাল কিয়ামতের ময়দানে জিজ্ঞাসা করবেন। যদি কোন অভাবী ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়ে আপনার কাছে যায় আর যদি তাকে সাহায্য না করে ফিরিয়ে দেন, একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আপনার নিকট অন্ন চাইলে যদি তার নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নেন, আপনার সাম্রাজ্যে যদি অন্যায় অবিচার চলতে থাকে এবং তার যদি যথাযথ প্রতিকার না করেন তাহলে আপনি শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হবেন এবং সমস্ত অন্যায়-অবিচারের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দোষী সাব্যস্ত হবেন"। এবার খলিফা হারুন অর রশীদ হাউমাউ করে কান্না করতে লাগলেন এবং একপর্যায়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। খলিফার সাথে আসা মন্ত্রী খলিফার এ অবস্থা দেখে হযরত ফোদায়েল (রাদ্বি.) কে তাঁর বক্তব্য থামাতে বললেন। এতদ্ শ্রবণে হযরত ফোদায়েল (রাদ্বি.) বললেন : "খলিফার সাথে আসা মন্ত্রীর এরূপ কথা বলাও একটি অন্যায়। কারণ সে নিজেকে খলিফার মর্মবেদনার সাথে একাত্ম করতে পারে নি।"

খলিফা হারুন-আল্ রশীদ হযরত ফোদায়েল (রাদ্বি.) এর অতি মূল্যবান উপদেশাবলীর জন্য তাঁর সামনে কিছু অর্থকড়ি রাখলেন। এতদ্দর্শনে হযরত ফোদায়েল (রাদ্বি.) খুবই রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, "আপনি আমার নিকট হতে কিছুই শিখতে পারেননি বরং এখনই অন্যায় আচরণ শুরু করেছেন। আমি আপনাকে মুক্তির পথে আহবান করছি আর আপনি আমার উপর দুনিয়ার বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন। আমি আপনাকে বলছি- আল্লাহর ওয়াস্তে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ত্যাগ করুন আর যার সম্পদ তাঁকে দিয়ে দিন। আপনি তা না করে অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন না করে আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যান, আপনি কখনও আমার কাছ থেকে কিছুই শিখতে পারবেন না।" হযরত ফোদায়েল (রাদ্বি.) রাগান্বিত হয়ে ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন। খলিফা হারুন-অর-রশিদ তাঁর পিছু ছুটলেন এবং একবার ফিরে তাকানোর জন্য অনুরোধ করলেন কিন্তু হযরত ফোদায়েল (রাদ্বি.) তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না এবং খলিফার সাথে কোন সাক্ষাৎ করবেন না বলে জানিয়ে দিলেন।

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর নির্বিলাস জীবন

● মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ●

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নৈকট্য নেয়ামত প্রাপ্ত বন্ধু সমস্ত নবী রাসুল (আঃ) সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আউলিয়া কেরামগণ (রহঃ) মহান আল্লাহ্‌তা'লার রঙ্গে রঞ্জিত ও ধনে ধনবান। তাঁরা যাবতীয় মানবিক গুণাবলীতে গুণান্বিত ছিলেন। তবুও তাঁরা অতি সাদাসিধা সাধারণ জীবন যাপন করতেন। আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হওয়ার পরও তারা অতি সাধারণ নির্বিলাস বিনয়, বিশ্বাস, আনুগত্যশীলতাসহ সকল প্রকার মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী হয়ে অতুলনীয় জীবন যাপন করেছেন। যার কারণে আল্লাহ্‌তা'লা সকলকিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)। তিনি সকল প্রকার মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। ইচ্ছে করলে তিনি অত্যন্ত আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করতে পারতেন। তবুও তিনি অতি সাধারণ জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আর এ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মহান আউলিয়া কেরামগণ তাঁর আদর্শের ধারক ও বাহক হতে পেরেছেন। বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সেই মহান আদর্শের যোগ্যতাসম্পন্ন উত্তরসূরী আওলাদে রাসুল (দঃ) এবং একজন মহান মাদারজাত অলি। তাঁর পিতা হচ্ছেন উপমহাদেশের অন্যতম আধ্যাত্মিক সাধক মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার প্রবর্তক গাউসুল আজম হযরত শাহ্‌সূফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কেবলা আলমের আদরের নাতি অছি-এ-গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ), আর মাতা হচ্ছেন মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক সাধক গাউসুল আযম বিল বেরাসত হযরত শাহ্‌সূফি মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (কঃ)-এর শাহজাদী সৈয়দা সাজেদা খাতুন। মহান তিনে মহান শক্তিতে পরিপূর্ণ উচ্চতর মকামের মহান অলি মারাজাল বাহরাইন বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কেবলা আলমের উত্তরসূরী ও আদর্শের যোগ্যতা সম্পন্ন হয়েও আরাম-আয়েশের জীবন-যাপন ত্যাগ করে কঠোর রিয়াজত সাধনের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত নির্বিলাস নিরহংকার অতিসাধারণ জীবনযাপন করেন প্রেম ভালবাসায় পরিপূর্ণ মূর্ত প্রতীক হয়ে। প্রেমের কারণে তিনি স্রষ্টার নূরী জাতে মিলিত হতে পেরেছেন। প্রেমের কারণেই তিনি ভালবাসতে পেরেছেন স্রষ্টার সকল সৃষ্টিকে। তাইতো আপন মাশুকের প্রেমে বিভোর হয়ে কঠোর থেকে কঠোরতম রিয়াজত-সাধনার মধ্য দিয়ে মানুষ ও মানবতার কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। প্রচন্ড গরমে গায়ে দিতেন লেপ-তোষক-কম্বল। প্রচন্ড শীতে থাকতেন খালি গায়ে। এমন কি পানিতে ডুবে থাকতেন ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন। খালি পায়ে হাটতেন মাইলের পর মাইল। কখনো ঘন্টার পর ঘন্টা প্রখর সূর্যের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। অল্প আহার করতেন। নিদ্রাও যেতেন অল্প সময়। কখনো না খেয়ে বিনিদ্রায় থাকতেন দিনের পর দিন। পরিবার, প্রতিবেশি, আত্মীয়স্বজনসহ সকল মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালবাসা। ভালবাসতেন এ দেশকে। ভালবাসতেন স্রষ্টার সকল সৃষ্টিকে।

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর বোন সৈয়দা মোবাশ্বেরা বলেন, ছোট ভাইয়েরা আগে ঘুমোতেন, লেখাপড়া সেরে বড় দাদা একটু রাত করে ঘুমোতেন। শোবার আগে দেখতেন ছোট ভাইদের বিছানাপত্র। কোন অসুবিধা হলে ঠিকঠাক করে দিতেন। বাসায় আগে আসলে নিজেই করতেন ভাইদের নাস্তা খাবারের ব্যবস্থা। পরে আসলে খোঁজখবর নিতেন। শহরের পালাপার্বন উৎসবে ভাইদের সঙ্গে নিয়ে বেড়াতেন। অসুখ বিসুখে মায়ের মত আন্তরিক সেবাযত্নে সারিয়ে তুলতেন।

শাহানশাহ্ বাবাজানের ছোটভাই ডাঃ সৈয়দ দিদারুল হক মাইজভাণ্ডারী বলেন, বড় দাদা শৈশবকাল হতে বাবা-মা, ভাই-বোনকে, শ্রদ্ধা, স্নেহ-ভালবাসায় সেবাযত্ন ও আদর করতেন। সেবক-সেবিকা থাকা সত্ত্বেও নিজ হাতে বাবার সেবা করতে চাইতেন। (পবিত্র হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, তার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি)

(মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত)

আত্মীয় অনাত্মীয় প্রতিবেশি সকলের সাথে সদয় ব্যবহার করতেন। আত্মীয়দের বাসায় গিয়ে দেখাশুনা ও খবরাখবর

নিতেন। তাঁর মত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আমাদের অন্য ভাইদের কারো পক্ষে সম্ভব হয়না।

(পবিত্র কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে, তুমি তোমার আত্মীয়ের অধিকার আদায় করো) (পবিত্র হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, আত্মীয়তার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা)

উপরে উল্লেখিত বর্ণনা, কুরআনের আয়াত, হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যায় শাহানশাহ বাবাজান যথাযথভাবে পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করেছেন, কারণ একজন আল্লাহ্‌র বন্ধুর পক্ষে কারো হক বিনষ্ট করা সম্ভব নয়। (পবিত্র হাদীস শরীফে আছে তোমাদের মধ্যে ঐ সমস্ত লোক সর্বোৎকৃষ্ট যারা পরিবারবর্গের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন) বাবাজানের শাহজাদা ও শাহজাদীগণ বাবাজানের আদরমাখা মায়ামমতা ভরা শৈশবের সেই স্মৃতিগুলো ভোলেননি। তাঁরা বলেন, বাবা আমাদেরকে খুব ভালবাসতেন, সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় মিষ্টান্ন খাবার খেলনা কতকিছু কিনে দিতেন। আমাদের নিয়ে বেড়াতে যেতেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে আরবী পড়তে যেতে বলতেন। বিস্‌মিল্লাহ বলে খেতে বলতেন। এতে নাকি বিষ পানি হয়। কাছে গেলে চা-নাস্তা-ভাত খেয়েছি কিনা জিজ্ঞেস করতেন। আরাম করতে বলতেন। বিছানায় শুইয়ে দিতেন। পরিবারের প্রতি বাবা অত্যধিক খেয়াল রাখতেন।

প্রতিবেশির হক আদায় করা, সাহায্য সহযোগিতা করা, খোঁজখবর নেওয়া, ইত্যাদি বিষয়ে পবিত্র কুরআন হাদীসে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে।

শাহানশাহ বাবাজানও প্রতিবেশিদের পরম ভালবাসতেন, অসহায় প্রতিবেশিদের টাকা পয়সা দিতেন, খোঁজখবর রাখতেন। প্রতিবেশি আইয়ুব আলী সাহেব বলেন, ঢাকার হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে আমার প্রথম ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়। আমি নিজ সন্তানকে দেখার আগে তিনি মাইজভাণ্ডার শরীফ থেকে একটি জীপ গাড়ি নিয়ে ঢাকায় পৌঁছে সরাসরি হাসপাতালে গিয়ে ছেলেকে দেখে দোয়া করেন। তিনি একবার আমাকে বলেন, যা কিছু প্রয়োজন আমাকে বলবেন অন্যখানে যাবেন না। তিনি আরো বলতেন, মহব্বতের লোকজনদের দেখাশোনা না করলে, মহব্বত মরে যায়। রুহের মত মহব্বতও আল্লাহ্‌র নূর। রুহ্ যেমন দেখা যায়না মহব্বতও তেমন দেখা যায় না। রুহ দেহের সাথে, মহব্বত মানুষসহ সকল কিছুর সাথে সম্পর্কিত।

(পবিত্র বোখারী শরীফে আছে চাকর-বাকর দাস-দাসীরা হল তোমাদের ভাই)

বাবাজান খাদেম, চাকর-চাকরানী সকলকে গভীর স্নেহ ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখতেন। সকলকে সম্মানসূচক সম্বোধন করতেন। পুরুষদের মিয়া সাহেব, মেয়েদের খালা, মাধু বলে ডাকতেন। ষাট বছরের বয়স্ক খাদেমা বেলুর মা বলেন, সেবা কতটুকু করতে পেরেছি জানিনা। কিন্তু তার স্নেহ প্রীতিমাখা ব্যবহারে পরিবার-পরিজন ছেড়ে দীর্ঘদিন ধরে এখানে পড়ে আছি। খাদেমা শামীমা বলেন, বাবা কী যে স্নেহ করতেন বলতে পারব না। খাওয়া দাওয়া সুখ অসুখ সবকিছুর খবর নিতেন। কর্মচারী জহুর বলেন, একবার খুব সকাল বেলা গরুর গাড়িতে করে ভিতর বাড়ির জন্য কিছু মাটি নিয়ে যাচ্ছিলাম। গাড়ি হুজরার পাশে আসলে বাবাজান হঠাৎ দরজা খুলে বাইরে আসেন। আমি গাড়ি থামিয়ে সালাম করলাম। আমাকে বলেন, কষ্ট করবেন না। কার আদেশে মাটি এনেছেন? এখানে আমার হুকুম ছাড়া কিছু করবেন না। শাহানশাহ্ বাবাজান একবার দুটি গাড়িতে ১৫-২০ জন সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার জমিদার ওয়াজেদ আলী খানের বাড়িতে এক আত্মীয়ের ঘরে যান। শাহানশাহ্ বাবাজানকে কাছে পেয়ে আত্মীয় পরিবার আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছাগল, মোরগ, পুকুর থেকে মাছ তুলে নানারকম সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করে। খাবারের সময় হলে খাবার না খেয়ে এক প্রকার জোর করে উপোষ চলে আসেন। পথে সঙ্গিদের বাবাজান বলেন, গরিবদের কেউ ভাল খাবার দেয়না। আমরা না খাওয়ায় আজ চাকর-বাকররা ভাল খাবার খেতে পারবে। এভাবে বিভিন্ন সময় তৈরি খাবার না খেয়ে চলে আসতেন। অনেক সময় বাহিরাগতদের ডেকে ডেকে খাওয়াতেন।

বাবাজান ছোট ছেলে মেয়েদের শিশুদের খুব আদর স্নেহ করতেন। আপনি বলে সম্বোধন করতেন। ছোট শিশুদের কোলে নিয়ে আদর করতেন। খাবার খেতে দিতেন। দরবারের কর্মচারীদের ছোট ছেলে-মেয়েদের দুধ, হরলিক্সসহ বিভিন্ন খাবার মায়ের মত আদর যত্ন করে খাওয়াতেন। তাদের সাথে শিশুসুলভ মিষ্টি ভাষায় কথা বলতেন। জামা কাপড় খেলনা কিনে দিতেন। তিনি বলেন, শিশুরা মাসুম আল্লাহর অলি, শিশু কিশোরদের দরবারে আনা নেওয়া ভাল - এতে তারা আদব আখলাক বুঝ জ্ঞান দয়া রহমত পাবে।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া না দেখায় এবং ছোটদের প্রতি আমাদের বড়দের কী কী অধিকার আছে তা সে জানেনা, সে আমাদের সমাজভুক্ত নয়।

একজন মণীষী বলেন, একজন মহান ব্যক্তির মহত্ব বোঝা যায় ছোটদের সাথে তার ব্যবহার দেখে।

ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ। শাহানশাহ্ বাবাজান ছিলেন ক্ষমাশীল। শাহানশাহ্ বাবাজান থেকে অনেকে লোভে পড়ে টাকা পয়সা জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যেত। তিনি দেখতেন ও জানতেন। তারপরও না দেখার ভান করে থাকতেন। দরোয়ান বা বিশ্বস্ত কেউ দেখে ফেললে চোরদের শাস্তির ব্যবস্থা করলে তিনি নিষেধ করতেন। একদা স্থানীয় এক ব্যক্তি কিছু টাকা ও একটি দামী হাতঘড়ি চুরি করলে এলাকার চেয়ারম্যান ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে চাইলে শাহানশাহ বাবাজান এসে বলেন, এই টাকায় একটি নখ উল্টে গেলে তাও ঠিক করা যাবেনা। ছেড়ে দিন। শাহানশাহ্ বাবাজান ঐ ব্যক্তিকে স্নেহভরা কণ্ঠে বলেন, মামু সাহেব বাড়ি গিয়ে আরাম করুন। এভাবে অনেক দোষী-পাপী-তাপী ক্ষমা চাইতে আসতেন তিনি উজাড়ভাবে ক্ষমা করতেন। (পবিত্র হাদীস শরীফ- কেহ ক্ষতি করলেও তাহাকে ক্ষমা কর)

শাহানশাহ্ বাবাজান অসহায় দরিদ্র দুঃস্থদের ভালবাসতেন। সাহায্য সহযোগিতা করতেন। পবিত্র কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে তাদের (ধনীদের) ধন সম্পদে গরিব ও বঞ্চিত লোকদের হক বা অধিকার রয়েছে। (পবিত্র হাদীস শরীফে আছে কোন ব্যক্তি যদি হালাল পথে উপার্জিত সম্পদ দান করে, সেই দানকৃত বস্তু যদি একটি খেজুর পরিমাণও হয়, তবে আল্লাহ্তায়ালা তাকে পাহাড় পরিমাণ নেকি দিবেন) শাহানশাহ্ বাবাজান অকাতরে গরীব দুঃখীদের টাকা পয়সা মূল্যবান জিনিসপত্র দান করতেন। তিনি বলতেন টাকা পয়সা প্রয়োজনীয় খরচের জন্য ও কারো ভোগ বিলাসের জন্য নয়। বেশি টাকা পয়সা জীবনকে কলুষিত করে। আল্লাহ্র সম্পর্ক ভুলিয়ে রাখে। আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের জন্য মানুষের সৃষ্টি, টাকা কড়ি দুনিয়া পূজার জন্য মানুষের সৃষ্টি নয়।

(পবিত্র হাদীস শরীফে আছে সৃষ্ট জীবের প্রতি এরূপ ব্যবহার করো যা অপরের অনুসরণীয় হতে পারে) একদা রাখাল ভুলে গরু/মহিষকে কুঁড়া-পানি না খাওয়ায়ে গোয়াল ঘরে বেঁধে রাখে। গভীর রাতে বাবাজান রাখালকে ডেকে গরু/মহিষকে কুঁড়া-পানি খাওয়ান। মঞ্জিলের এক কর্মচারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন গরুকে কি মারধর কর? জনৈক ব্যক্তি দরবারে একটি মানতি গরু হাদীয়া আনলেন। গরুটি জবেহ করার প্রস্তুতি নিলে বাবাজান বলেন গরু জবেহ করবেনা যে। গরুটি পূর্ব দিকে আমগাছে বেঁধে কুঁড়া পানি খাওয়ান। আদর মহব্বত করুন।

আট দশটি কুকুর বিড়াল মঞ্জিল প্রাঙ্গণে থাকত। বাবাজান কেক মিষ্টি এমনকি পিরিচ থালা করে চা ভাত মাংস আদরের সাথে খাওয়াতেন। কোন কোন কুকুর বিড়াল বাবাজানের খাটের নিচে প্রায় সময় শুয়ে থাকত।

(পবিত্র হাদীস শরীফে আছে তিনি খোদার প্রিয় যিনি সৃষ্ট জীবকে ভালবাসেন)

ধনসম্পদ টাকা পয়সা পার্থিব কোন কিছুর প্রতি লোভ কিংবা মোহ ছিলনা। হুজরা শরীফ মোজাইক দিয়ে সুন্দর করে পাকা করার অনুমতি চাইলে শাহানশাহ বাবাজান বলেন কী হবে অত পাকা করে। "এ দুনিয়া মুসাফিরখানা"।

নিজের ঘরটি সমাপ্ত করতে না দিলে শেষ পর্যন্ত অসমাপ্ত থেকে যায়।

শাহানশাহ্ বাবাজান অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করাকে ঘৃণা করতেন। আশেক-ভক্তদের দেওয়া অর্থের মধ্যে তিনি অনেক টাকা পুড়ে ফেলতেন। তিনি বলতেন, সব টাকা ভাল নয়, তাই পুড়তে হয়। তিনি একসাথে ৫০ হাজার ৭০ হাজার এমনকি লাখ লাখ টাকা পর্যন্ত পুড়ে ফেলতেন। শাহানশাহ বাবাজানের মহান বাণী হচ্ছে "সম্পদে নয় ঈমানে পুলসিরাত পার"।

শাহানশাহ বাবাজানের কাছে ধনী-গরিব ভাল-খারাপ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই আসতেন বাবাজানের দয়া মেহেরবানী পাওয়ার আশায়। কাউকে তিনি নিরাশ করতেন না। শুধু জাগতিকভাবে নয় আধ্যাত্মিক বলে যে কোন সমস্যা বা ফরিয়াদ নিয়ে যে আসুক না কেন তিনি দয়া মেহেরবানী করতেন। তিনি বলতেন "আল্লাহ্র অলির দরবারে আমীর ফকিরের তফাৎ নেই"।

"দরবারে হিন্দু মুসলিম কোন ভেদাভেদ নেই - সব এক আল্লাহ্র সৃষ্টি"।

"আমার দরবার প্রাচ্যের বায়তুল মোকাদ্দাস, সকল জাতির মিলনকেন্দ্র"।

"যেমন তেমন ভেবো না, মাইজভাণ্ডার এক অনন্ত সাগর"।

"খাল-নদী-নালা দিয়ে কত ময়লা আবর্জনা মহাসাগরে গিয়ে পড়ে কিন্তু মহাসাগরের কিছু হয়না। মহাসাগর ঠিকই থাকে।"

বাবাজানের মহান বাণীগুলো যথার্থ অনুধাবন করলে বুঝা যায়, তিনি ধনী-গরীব ভাল-খারাপ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভেদাভেদহীন ঐক্যের সাম্য মৈত্রী ভ্রাতৃত্ব অসাম্প্রদায়িক সার্বজনীন এক মহান দয়ার চাদরে সকলকে ঠাঁই দিয়েছেন। দরবারে আগত মেহমানবৃন্দের মেহমানদারী করা ছিল

শাহানশাহ্ বাবাজানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শাহানশাহ্ বাবাজানকে দেখার যাদের সৌভাগ্য হয়েছিল সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে বাবাজানের আতিথেয়তা এবং মিষ্টি সুমধুর ভাষার। (পবিত্র হাদীস শরীফে আছে, যে খোদার উপর ও ভবিষ্যত জীবনের উপর বিশ্বাস রাখে সে অতিথিকে সম্মান করে)। অভ্যাগত অতিথিদের যথাসাধ্য সম্মান করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যই কর্তব্য। তিনি সর্বদা মানুষ ও মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। অপরকেও পরামর্শ দিতেন মানব কল্যাণের। ড. কাসেম সাহেবকে একদিন বলেন, যে মানব কল্যাণে কাজ করে আল্লাহ তার কল্যাণ করেন। (পবিত্র হাদীস শরীফে আছে যার দ্বারা মানব উপকৃত হয় তিনি উত্তম পুরুষ। যিনি বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধন করেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ)।

শাহানশাহ্ বাবাজানের পিতা অছিয়ে গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) পুত্রের মানবিক পরিচয়ের অবস্থান সম্পর্কে বলেন আমার বড় মিঞা সাধনা বলে যেখানে উঠেছেন তার উপর ইনসানিয়তের (মানবতার) আর কোন স্থান নেই। তিনি আরো বলেন মানবতার সর্বোচ্চ স্তরে আমার বড় মিঞার অবস্থান।

শাহানশাহ্ বাবাজান মানুষের সেবা ও দেশের জনগণের সেবা করার উপদেশ দিতেন। জনৈক সরকারী কর্মকর্তাকে তিনি উপদেশ দিয়ে বলেন, আপনারা উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার। মানুষ আপনাদের কাছেই আদব আখলাক নীতি আদর্শ শিখবে। তাই আচার আচরণে শালীনতা বজায় রাখবেন। দুর্নীতি করবেন না। মানুষের সেবা করবেন। মানুষের সেবা করাও আল্লাহ্র ইবাদত। সচিবালয়ের এক কর্মকর্তাকে বলেন, ঘুষ খান? ঘুষ খাবেন না। সৎভাবে জনগণের সেবা করবেন। ১৯৮৭ সালের তৎকালীন এক মন্ত্রীকে উপদেশ দিয়ে বলেন সন্তান কষ্ট পেলে বাবা-মার কষ্ট হয়। দেশের মানুষ কষ্ট পেলে সরকারেরও কষ্ট হয়। জনগণতো আপনাদের সন্তানের মত। তাদের যাতে কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। মনে রাখবেন, জনগণের সুখ-শান্তিতে সরকারের শান্তি ও স্থিতি।

পবিত্র হাদীস শরীফে আছে ঐ সমস্ত শাসক সর্বনিকৃষ্ট যারা প্রজা নিপীড়ন করে।

প্রবাদ আছে, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। শাহানশাহ্ বাবাজান কর্মঠ ব্যক্তিকে পছন্দ করতেন। তিনি বলেন কাজের জন্য জগৎ জীবন ও আল্লাহর রাসুলের বিধান। উৎপাদন ও সৃষ্টির কাজ উত্তম ইবাদাত। অলস হয়ে বেকার বসে থেকো না। যে কোন ভাল কাজ আল্লাহ্র ইবাদাত।

শাহানশাহ বাবাজান অসংখ্য বেকারদের তাঁর আধ্যাত্মিক দয়া-মেহেরবাণীতে কর্মজীবী হিসেবে গড়ে তোলেন।

আমার ঐ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যে বা আমি বাঁধি তার ঘর।
আপন করিতে খুঁজিয়া বেড়াই, যে মোরে করেছে পর।

একদা কবি জসিম উদ্দিনের কবিতার এ চার লাইন তিনি দরদভরা কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগলেন। এ সময় উপস্থিত দরবারের একজন আওলাদে পাককে বললেন, এটাই আমাদের নীতি, কেউ খারাপ করলেও তাদের ভাল করা।

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমণ, হয়েছে চির স্মরণীয়,
সে পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে আমরাও হব বরণীয়। পাঠ শেষে মন্তব্য করেন অবশ্যই আমাদের লক্ষ্য বা পথ সেটাই হওয়া উচিত। তিনি আরো বলেন, পরস্পর সহযোগিতা ছাড়া কোন মানুষ সমাজে একা বাস করতে পারেনা।

উপরে উল্লেখিত কবিতা আবৃত্তি, মন্তব্য থেকে বুঝা যায় কত বড় মহৎ মনমানসিকতা নিয়ে মানুষের কথা ভাবতেন তিনি। পৃথিবীতে মানুষের আসার গুরুত্বটাই তিনি তুলে ধরেছেন।

স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ। তাই আল্লাহর প্রিয় বন্ধুগণ নিজ জন্মভূমিকে ভালবাসতেন। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ(দঃ) মদিনায় যখন হিযরত করছিলেন বারবার মক্কা শরীফের দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলেন এবং আফসোস করে বলেছিলেন হে আমার স্বদেশ তুমি কত সুন্দর আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার আপন গোত্রিয় লোকেরা যদি ষড়যন্ত্র না করত আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।

শাহানশাহ্ বাবাজান নিজ মাতৃভূমিকে খুব ভালবাসতেন। একদা এক ব্যক্তি টাকা রোজগারের জন্য বিদেশ যাওয়ার ফরিয়াদ করলে শাহানশাহ্ বাবাজান বলেন, গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারীর এ দেশ গরীব নয় ধনী।

শাহানশাহ বাবাজান আপন মনে গাইতেন ধনধান্যে পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।

প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ। বাংলাদেশ। বাংলাদেশ।

উপরে উল্লেখিত মহান বাণী ও দরদ ভরা কণ্ঠে গাওয়া দেশাত্মবোধক গানগুলো থেকে বুঝা যায় তিনি কতটা আপন জন্মভূমি বাংলাদেশকে ভালবাসতেন।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) বলেছেন- প্রভুর পরিচয় লাভ করতে হলে আত্মপরিচয় লাভ কর। যে স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও হাকীকত সম্বন্ধে অবগত নয় সে কেমন করে পরম

সত্ত্বার সন্ধান লাভ করবে? কবি আল্লামা ইকবাল বলেন নিজেকে চিনে হওগো তুমি স্বয়ং খোদার ব্যাখ্যাকার (কবি নজরুল ইসলাম অনূদিত)।

শাহানশাহ্ বাবাজানের মহান বাণী হচ্ছে 'নিজের ভিতর দৃষ্টি দাও, বহির্জগতের চেয়ে সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখতে পাবে'।

তাই কবির ভাষায় বলতে হয়ঃ

যাকে দু চোখ খুঁজিয়া বেড়ায়
মসজিদ মন্দির গীর্জায়
সেই তো আছে অতি নিকটে
আপনার মাঝে লুকায়
নিজেকে চিনিতে পারিবে যখন
অন্তর চক্ষু যাবে খুলিয়া
দেখিতে পাইবে তখনি
সে অপরূপ প্রাণ প্রিয়া।

আমরা আত্মসমালোচনা না করে অপরের সমালোচনায় মেতে থাকি। শুধু তা নয় অপরের উন্নতি ও সৌন্দর্য দেখে হিংসা করি। অথচ নিজের মাঝে সে সৌন্দর্য বিরাজমান। শাহানশাহ্ বাবাজানের উপরে উল্লেখিত মহানবাণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(পবিত্র হাদীস শরীফে আছে কখনও অপরের দোষ অনুসন্ধান করবে না। অপরকে হিংসা করবে না)।

শাহানশাহ্ বাবাজানের পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ, চরিত্র, আচার-আচরণ, আমার মত নিকৃষ্ট জ্ঞানহীন অধমের পক্ষে স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা কোনদিনও সম্ভব নয় তবুও শাহানশাহ্ বাবাজানের দয়া মেহেরবাণী প্রত্যাশায় এ লেখার প্রয়াস।

শাহানশাহ্ বাবাজানের জীবন আদর্শে দেখা যায়, প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহ্ ও রাসুলের নির্দেশিত পন্থায় জীবন পরিচালনা করেছেন।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) বলেন, সুন্দর ব্যবহারই পূণ্য।

নিশ্চয় মোমিনের পাল্লায় যে জিনিসটি ভারী হবে তা হল উত্তম চরিত্র।

সত্যিকার মোমিন তারাই যাদের চরিত্র সুন্দর।

বিনয় ও নম্রতা ঈমানের দুইটি শাখা ।

বিনয় ও নম্রতা ধর্মের কার্য।

স্বভাব-চরিত্রে যিনি সর্বোত্তম, ঈমানদারের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

শাহানশাহ্ বাবাজানের জীবন আদর্শ সেই উত্তম চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি এবং তাঁর জীবন আদর্শ চির সত্যের জ্যোতিতে আলোকিত।

অন্যদিকে সুলতানুল মালাইকা আযাযীল (চির অভিশপ্ত শয়তান) নমরুদ, ফেরাউন, এয়াজীদ ও এদের অনুসারীরা মহান আল্লাহ্তায়ালার সামান্যতম মেহেরবানী পাওয়ার পরে অবিশ্বাসী, নাফরমানী, অত্যাচারী, অহংকারী, মিথ্যাবাদী, লোভীতে পরিণত হয়েছে। (পবিত্র হাদীস শরীফে আছে, যার মধ্যে কণামাত্র অহংকার রয়েছে সে স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করতে পারবেনা) (তিন বস্তু মানুষকে ধ্বংস করে থাকে লোভ, হিংসা, অহংকার)।

(পবিত্র কুরআন শরীফে রয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারী এবং মিথ্যাবাদীকে সৎ পথে পরিচালিত করেননা)।

সুলতানুল মালাইকা আযাযীল নয় লাখ নয় হাজার নয় শত নিরানব্বই বছর আল্লাহ্তালার ইবাদত করেছিল। এমনকি ফেরেস্তাগণের সর্দারও ছিল। কিন্তু অহংকারে বশীভূত হয়ে আল্লাহ্তালার আদেশ অমান্য করায় চির অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয়েছে। এভাবে নমরুদ, ফেরাউন, এয়াজীদ ও এদের অনুসারীরা কালে কালে নিজকর্ম ও কার্যকলাপের দরুন ইতিহাসের ঘৃণিত ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কথায় আছে যেমন কর্ম তেমন ফল।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদের এসব লানত প্রাপ্তদের ও তাদের অনুসারীদের অপছায়া ও সংস্পর্শ থেকে হেফাজত করুন। আমাদের ঈমান রক্ষা করুন। আমীন

হে আল্লাহ চালাও মোদের সঠিক সোজা পথে, তাদের পথে যাদের দিয়েছ বহু নেয়ামত।

সূফি উদ্ধৃতি

■ একীন একটি নূর যদ্বারা বান্দা নূর বিশিষ্ট হয় এবং যা বিশ্বাসী ব্যক্তিকে পরহেজগারীর পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।

–হযরত আবু বকর ওয়াররাক (র.)

■ তাসাউফ হলো মানুষের উন্নত চরিত্রের নিদর্শন। যার চরিত্র বা আখলাক যত বেশী উন্নত, তার তাসাউফও তত বেশী উন্নত।

– হযরত শায়খ আবু বকর কেতানী (র.)

"রাহ্‌বারে আলম হযরত শাহ্‌সূফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (মঃ) আল্‌ মাইজভাণ্ডারীর একটি ভাষণ"

● অধ্যাপক কাজী ফরিদ উদ্দিন আখতার ●

গত ১০ পৌষ ১৪১৯ বাংলা ২৪ ডিসেম্বর (২০১৩) বিশ্বঅলি শাহানশাহ্‌ হযরত শাহ্‌সূফি মাওলানা সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) খোশরোজ শরীফ উপলক্ষে শাহানশাহ্‌ কেবলার একমাত্র শাহ্‌জাদা রাহ্‌বারে আলম হযরত শাহ্‌সূফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃ) উপস্থিত আশেক ভক্ত অনুরক্ত তথা মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার অনুসারীগণের উদ্দেশ্যে যে মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন তা আমার কাছে অত্যন্ত দিক-নির্দেশনা মূলক বিশেষতঃ এই তরীকার অনুসারীদের জন্য শিক্ষনীয় বলে মনে হয়েছে। আমি ভাষণের পুরোটা শুনতে পারিনি কারণ ভাষণ শুরুর ১৫/২০ মিনিট পর সমাবেশে উপস্থিত হয়েছি। শেষ অংশটুকু আমার শুনার সৌভাগ্য হয়েছে। তাতে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে তাঁর মতামত ও উপদেশ ছিলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সময় উপযোগী। যেমন তিনি দুস্থ মানবতার সেবা, ধর্মসাম্য, ধনসাম্য, বিচারসাম্য ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ জাগরণে তাঁর অনুসারী তথা মাইজভাণ্ডার শরীফে যাঁরা আসা যাওয়া করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। তিনি খুব স্পষ্ট এবং জোরের সঙ্গেই বলেছেন, অনুষ্ঠানাদি যখন কেবল আচার সর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়, যখন তার দর্শন থেকে অনুসারীগণ গাফেল হয়ে পড়েন, তখন তা প্রাণহীন হয়ে কল্যাণের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। কল্যাণের জন্য ব্যক্তি নিজের মধ্যে যে সকল মূল্যবোধ অর্জন না করলে উন্নত মানুষ হওয়া যায়না সেগুলো অর্জনের জন্য তরিকার দিকনির্দেশনা অনুশীলন, চর্চা এবং ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগের দায়িত্বশীলতার যে বোধ ও বোধন মন এবং মননে যে সকল গুণাবলী ব্যক্তির আচরণে থাকতে হবে তার দিকে মনোযোগী হতে সকল মাইজভাণ্ডারী অনুসারীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি বার বার বলেছেন ব্যক্তি নিজের উন্নতির পাশাপাশি পরিবার বা সমাজকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে না পারলে বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণ সম্ভব হবে না। তাই তিনি ব্যক্তি ও সামষ্টিক উন্নতির প্রচেষ্টায় সকলকে দায়িত্বশীল হতে বলেছেন। প্রসংগক্রমে বাবাজান শাহানশাহ্‌ কেবলার একটি মহা মূল্যবান বাণী এ মুহূর্তে আমার স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠেছে। বাবাজানের অমূল্য বাণীটি হলো 'আমার তরিকা মানুষ সৃষ্টির তরিকা, ইনসান সৃষ্টির তরিকা'। মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আনার জন্যই মূলতঃ অলি আল্লাহ্‌গণের এ ধরায় আগমন। ত্যাগ-তিতীক্ষার কথা বলতে গিয়ে মওলা হুজুর (হাসান মাওলা) সাহাবা-এ কেরামগণের জীবনাদর্শের দিকে তাকাতে সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। যাঁরা রাসুল (সঃ) এর জন্য অর্থাৎ ইসলামের শাশ্বত ঐশীবাণী জগতের বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাহাবা-এ কেরামগণ কী না হারিয়েছেন? ত্যাগের কী মহিমা তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বাবাজান শাহানশাহ্‌ কেবলার মহান জীবনাদর্শে। এখন আমরা তার কতটুকু বৈশিষ্ট্য নিজেদের মধ্যে ধারণ করেছি এবং আমাদের নতুন প্রজন্মকে সেই আদর্শে কতটুকু অনুপ্রাণিত করতে পেরেছি তার অনুসন্ধান করে সময়োপযোগীভাবে আত্মোপলব্ধি খুবই প্রয়োজন। আমরা ত্বরিকাপন্থিরা প্রায়ই বলি "এক জামানা সোহ্‌বতে বা আওলিয়া বেহেতরে ছদ্‌ ছালে তা-আতে বেরিয়া" মূলতঃ এই মূল্যবান বাণীটি প্রকৃত আমলকারীর জন্যই শতভাগ প্রযোজ্য, আর যে সব লোক গাফেল বা গোমরাহ তাদের জন্য নয়। এ শিক্ষা ইতিহাসে স্পষ্টতর হয়ে আছে। হযরত আদম হাওয়া (আঃ), ইবলিশ শয়তান দ্বারা প্রতারিত ও প্ররোচিত হয়ে স্বর্গচ্যুত হলেও সূক্ষ্মভাবে লক্ষণীয় যে আনুগত্য, ভক্তি, বিশ্বাস, বিনয় দ্বারা এই আদম সন্তান আবার সেই ফেরেস্তাকেও অতিক্রম করে খোদ খোদার নৈকট্য হাসিল করতে সক্ষম হয়েছেন। অথচ ইবলিশ আজ অবধি শয়তান। আমল না করার কারণে আবু লাহাব আবু জাহেলরা নবীর দর্শনলাভ করতে পারেনি। অথচ তারা তো আশৈশব নবীকে দেখেছে। রাহবারে আলমের সে দিনের ভাষণ মূলতঃ ত্বরিকাপন্থিদের জন্য সৎ আমল করার তাগিদ সম্বলিত এক ঘোষণা বৈকি। তিনি তাঁর ভাষণে একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাহলো "তাযিমী সেজদা" এ বিষয়টি তিনি সমাবেশে প্রকাশ্যে বিশ্লেষণ করেছেন। কুতর্ক পরিহার করে যদি কোন ব্যক্তি সত্যিকারের সত্যানুসন্ধানের দৃষ্টি নিয়ে সেই সমাবেশে উপস্থিত থেকে থাকেন তিনি তার সেজদা সম্পর্কিত বিষয়ের উত্তর বা ব্যাখ্যা পেয়ে গেছেন। (কেবল নিন্দার দৃষ্টি নিয়ে যারা দরবারে আসে তারা ব্যতিত) এ প্রসঙ্গে আমার স্মৃতির পাতায় উজ্জ্বল একটি ঘটনা উল্লেখ করছি- সে দিনটি ছিল ১০ মাঘ ২৪ জানুয়ারী ১৯৮৭ সন। বাবাজান শাহানশাহ্‌ কেবলা বিশিষ্ট শিল্পপতি মরহুম মির্জা আবু সাহেবের চট্টগ্রাম শহরস্থ

বাসভবন "টাওয়ার হাউসে" অবস্থান করছিলেন। রাত ১২টা নাগাদ বাবাজান স্বীয়কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলে আমরা কয়জন বাবাজানকে সেজদা করে ভক্তি প্রকাশ করলাম।

বাবাজান আমার পাশে সেজদারত আমারই এক আত্মীয়ের উপর ভয়ানক রাগান্বিত হয়ে বলতে লাগলেন, এটা তোমার সেজদার জায়গা নয়, আমি তোমাকে মারব ইত্যাদি .....। অথচ আমার দিকে চেয়ে অত্যন্ত শান্তভাবে বললেন "গোলামের বাচ্চা গোলামরা সেজদা করে জ্বে, আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের তাবেদার"। আসলে তাজিমী সেজদার মাধ্যমে মুর্শিদের প্রতি ভক্তি-প্রেম প্রকাশ করা হয়। যা ভক্তিপূর্ণ কদমবুচিরই একটু অগ্রসর প্রকাশ। অন্তরে মুহাব্বত না থাকলে সেজদা করে কী লাভ? যদি মুহাব্বত থাকে সেজদা না করলেই বা কী? বাবাজান বলেন "এখানে মুহাব্বত বিনিময় হয় জ্বে, ভক্তি আর বিশ্বাসের বা ঈমানের দ্বারা পুলসেরাত পার হতে হবে, টাকা পয়সা ধন সম্পদ তখন কোন কাজে আসবেনা।" পুনরায় বলেন, "আমার ত্বরিকা মানুষ সৃষ্টির ত্বরিকা। সৃষ্টি রহস্য কয়জন বুঝে?" আমি বাবাজানের উল্লেখিত কালাম বা বাণীর মাধ্যমে স্পষ্ট বুঝে নিতে সক্ষম হই তাজিমী সিজদার মাহাত্ম্য ও সেজদা নিষেধ করার মর্মার্থ। উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা গাজী শের-ই বাংলা হযরত সৈয়দ আজিজুল হক আল কাদেরী, গাউসুল আযম বিল বেরাসত হযরত শাহ্সূফি মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবাভাণ্ডারী (ক.) শানে যথার্থই বলেছেন "মাইজভাণ্ডার শরীফ সেজদা গা'হে আশেকাঁ" অর্থাৎ আশেকগণের জন্যই মাইজভাণ্ডার শরীফ সেজদার জায়গা। ১০ পৌষ ১৪১৯ বাংলা বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ কেবলার একমাত্র শাহ্জাদা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (মঃ) মাইজভাণ্ডারীর ভাষণ বাবাজানের সেই দিক নির্দেশনারই প্রতিধ্বনি। কবি নজরুলের ভাষায় "তরুণ প্রেমিক প্রণয় বেদন জানাও জানাও বে-দিল প্রিয়া। নহে ঐ এক হিয়ার সমান হাজার ক্বাবা হাজার মসজিদ"। মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা প্রথা অপেক্ষা প্রেমকেই প্রাধান্য দেয়। মানবিক প্রেমের পথে ঐশীপ্রেম অর্জনের পথ দেখায়, যা মূলতঃ ভক্তি ও বিশ্বাস দ্বারা অর্জন করতে হয়। ধর্মের প্রধান দু'টি দিক আছে, একটি প্রথা বা আচার যা বাহ্যিক, অন্যটি অন্তর্গত বা আত্মিক। বৃহত্তর সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে আচার ধর্ম খুবই গুরুত্ব বহণ করে। সাধারণত ইসলাম ধর্ম শরীয়ার বিধিবিধান দ্বারা আচার ধর্মের নিয়ন্ত্রণের কথা বলে। পক্ষান্তরে তাত্ত্বিক দিকটি বিচার বিশ্লেষণ করে সঠিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন হয় রহস্যজ্ঞানের। উদাহরণ স্বরূপ কুরআন পাকের সূরা বনি ইস্রাইলে বর্ণিত হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত খিজির (আঃ) এর মধ্যে সংঘটিত ঘটনা প্রবাহ থেকে জ্ঞানীগণ শিক্ষা নিতে পারেন। রাসূল (দঃ) এর জীবদ্দশায় আসহাবে সুফ্ফাগণ এই রহস্যজ্ঞানের চর্চায় কঠোর রেয়াজত বা সাধনায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করে গেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় ধর্মতাত্ত্বিক একাধিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। যেমন- খারেজি, রাফেজি, শিয়া, ইতাজিলা, মুতাজিলা, জাবুরিয়াহ, আশারীয়া ইত্যাদি। বিশ্ববরেণ্য ইসলামী আধ্যাত্মিক মহান ব্যক্তিগণ ইয্মা, কিয়াস, ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে একেক সময় বিভিন্নভাবে অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান দিতেন। এই প্রক্রিয়ায় হযরত সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী (রঃ), হযরত গাউসুল আজম পীরানে পীর দস্তগীর শেখ মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রঃ), হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রঃ), হযরত শামসীত্ তাবরীজ (রঃ), হযরত জালাল উদ্দিন রুমী (রঃ), হযরত ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ), মাযহাবের সু-প্রসিদ্ধ ইমামগণ সহ অনেক বিশ্ববিখ্যাত আলেমে দ্বীন থেকে আরম্ভ করে অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, যুগোপযোগীভাবে ইসলামের আলোক ছড়িয়ে সমসাময়িক যুগে উজ্জ্বলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। পাক কুরআন করিম ও পবিত্র হাদীস শরীফের কেবল আভিধানিক অর্থ দিয়ে যদি সমাধানের চেষ্টা করা হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। তাই কুরআন-হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য সঠিক অধ্যাত্মিকভাবে জ্ঞানী নায়েব-এ রাসূল বা অলি-এ কামেলগণের (রহস্যজ্ঞানের অধিকারী) স্মরণাপন্ন হতে হয়। মূলতঃ এই ঐশী জ্ঞানকে ইঙ্গিত করেই রাসূল (সাঃ) বলেছেন "আমি যদি জ্ঞানের শহর হই, আলী তার দরজা"। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাইতো বলেন "আমার মোহাম্মদের নামের ধ্যান হৃদয়ে যার রয়, খোদার সাথে হয়েছে তার গোপন পরিচয়"। মূলতঃ এই গোপন পরিচয়কে ইসলামী পরিভাষায় এলমে বাতেনী বা এলমে লদুনী বলা হয়। আমাদের ত্বরিকাপন্থিরা এই ধারাবাহিকতাকে নবুয়তের পর বেলায়তী কর্মপ্রবাহরূপে আখ্যায়িত করেন। অন্তরচক্ষু সম্পন্ন অলি আল্লাহ্গণ তাৎক্ষণিকভাবে অনেক দুরূহ ও জটিল প্রশ্নের উত্তর বা সমাধান দিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারেন যেমনঃ- সম্প্রতি 'কিউ টিভি'তে ডক্টর তাহের আল কাদেরীর বর্ণনায় পাওয়া যায়- একদিন সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়াজের এক

কামেল মুরিদ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন মসজিদ নির্মাণ করে কাবার নিশানা ঠিক করতে না পেরে দুইদল মুসলিম তুমুল ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে। তিনি (খাজা বাবার মুরিদ) তাদেরকে কাবা'র দিক ঠিক করে দিলে বিবাদমান লোকজন তাকে পাল্টা প্রশ্ন করল আপনার বক্তব্য যে সঠিক তার প্রমাণ কী? তখন কামেল লোকটি বললেন, তোমরা আমার দুই আঙ্গুলের ফাঁকে দৃষ্টিপাত করে দেখে নাও আমি যে দিকে কাবা বলেছি সেটা ঠিক কিনা। তারা উভয় পক্ষ সত্যই দেখতে পেল সে মহান ব্যক্তিটি সত্যিই সঠিক বলছেন। তাই তারা তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিল। এটা সম্ভব হয়েছিল অন্তরচক্ষুর অসাধারণ খোদা প্রদত্ত জ্যোতির কারণে, তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রকৃত অলি-আল্লাহ্‌দের সিদ্ধান্ত সর্বকালে সর্বজায়গায় অবশ্যই সঠিক ও নির্ভুল। শরীয়ার আইন অপরাধের মাত্রা নির্ধারণ দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে অপরাধ দমনে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু ত্বরিকত বৃহত্তর মানব কল্যাণকে মাথায় রেখে অপরাধকে ঘৃণা করতে বলে কিন্তু অনুতপ্ত অপরাধীকে নয়। কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ইসলামের প্রথম যুগে রাসূল (সাঃ)-এর সংস্পর্শে এসে অনেক বড় বড় অপরাধীও ক্রমে সৎপথ অবলম্বন দ্বারা বিখ্যাত সাহাবীতে পরিণত হয়েছিলেন। প্রকৃত নায়েব-এ রাসূল অলি-আল্লাহ্‌দের সংস্পর্শে চরম অধঃপতিত: মানবসন্তানও উন্নত মানবে রূপান্তরিত হতে পারেন। এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকাভুক্তদের মাঝেও রয়েছে। মানবতার ধর্ম ইসলাম একটি গণ্ডিবদ্ধ সংকীর্ণ গোঁড়া মৌলবাদী ধর্ম নয়। এটি একটি সার্বজনীন যুগোপযোগী প্রগতিশীল জীবন ব্যবস্থা, কেবল শরীয়া নির্ভর শাস্ত্রবিদদের মরমীসাধক লালনশাহ্ 'শাস্ত্রকানা' বলেছেন তাঁর কানার হাটবাজার নামক গানটিতে। পাশাপাশি তত্ত্বজ্ঞানী আধ্যাত্মিক সাধক ফকিহ্ দরবেশগণ বহুমাত্রিক জ্ঞানের অধিকারী বিধায় তারা কেবল শরীয়তের আইন দ্বারা ব্যক্তির কর্মকে বিচার বিশ্লেষণ করেন না। তাঁরা পরিচালিত হন অন্তরচক্ষুর দৃষ্টি দ্বারা অথচ যুগে যুগে হযরত রুমী (রঃ)-এর ভাষায় ঐ আহাম্মকের দল শাস্ত্রকানা এক দেশদর্শী অর্থাৎ বহুমাত্রিক জ্ঞানচর্চার অভাবে ঐ সব শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের মাঝে অন্তরচক্ষু বা উপনয়নের (রহস্য জ্ঞানসম্পন্ন দৃষ্টির) মৃত্যু ঘটিয়ে কেবল শাস্ত্র নিয়ে বিচার করতে গিয়ে বহু মহা মণীষীকেই দণ্ডিত করে বসেছে। যেমন Wise man of the old. গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস থেকে আরম্ভ করে প্রচলিত আচার বা ধর্ম ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে কায়েমী স্বার্থবাদী শাসকগোষ্ঠী নিজেদের দাপট টিকিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে বৈকি। তেমনি ইতিহাসে দেখা যায় যুগে যুগে ঐ সব নমরুদ ফেরাউন ইয়াজিদগণের প্রেতাত্মাগণ প্রচলিত শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মানবতাকে চিরতরে স্তব্ধ করতে চাইলেও মহান রাব্বুল ইজ্জত তাঁর মনোনীত ধর্মকে হেফাজত করেই রেখেছেন। আর ইতিহাসে সেইসব কুখ্যাতগণকে দৃষ্টান্তরূপেই রেখে দিয়ে সত্যানুসন্ধিৎসুদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের পথকে সুগম করেছেন। জাতীয় কবি নজরুল ঐ সব শাস্ত্রবিদ লোকদের বলেছেন "মূর্খরা সব শোন মানুষ এনেছে গ্রন্থ। কিতাব গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোন" মরমী মাইজভাণ্ডারী শায়েরগণ বলেন "মানুষ ছেড়ে খোদা ভজ, এ মন্ত্রনা কে দিয়াছে? মানুষ পুজ, কোরআন খোঁজ পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে। সৃষ্টির আড়ে পারওয়ারে এই মানুষেরই রূপনেহারে, তথায় ফেরেস্তা যাইতে নারে, মানুষ তথায় গিয়াছে"। মানুষের সেই পরিপূর্ণ রূপকেই সম্ভবত হযরত জালালুদ্দিন রুমী (রঃ) বলেছেন "ঐশী জ্যোতিসম্পন্ন সেই সব জ্যোতির্ময় মানুষ ফেরেস্তার সেজদা পাওয়ার যোগ্য"। পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে ফরিয়াদ করছি, হে খোদা আমরা যেন অলি-এ কামেলগণের আদর্শ অনুসরণ করতে পারি সে তওফিক দান করুন। হে খোদা আমাদেরকে সেই সব নেয়ামতপ্রাপ্ত আপনার প্রিয় বান্দাগণের পথে পরিচালিত করুন। সমাপ্তিতে রাহ্‌বারে আলম হযরত শাহসূফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান আল-মাইজভাণ্ডারীর দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং উল্লেখিত ভাষণের জন্য শোকরিয়া জানিয়ে লেখাটি শেষ করলাম। আমীন।

সূফি উদ্ধৃতি

■ প্রত্যেক ইবাদতেরই সওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র অলীদের ইবাদতের সওয়াব নির্দিষ্ট এবং প্রকাশ্য নয় বরং উহা আল্লাহ্‌র পবিত্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

–হযরত আবুল হাসান খারকানী (র.)

স্মৃতিতে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)

স্মৃতিচারণ করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ডা. কিউ এম অহিদুল আলম

(শেষ কিস্তি)

ডা. কিউ এম অহিদুল আলম। মেডিসিন, হাঁপানী ও এলার্জি রোগ বিশেষজ্ঞ। তাঁর বয়স এখন ষাট বছর। বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন তাঁর। বিদেশ থেকে হাঁপানী রোগ বিষয়ে বাংলাদেশের কোনো চিকিৎসকের প্রথম পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের কৃতিত্ব তাঁরই। বুলগেরিয়া সোফিয়া মেডিকেল একাডেমি থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি নেন। বিদেশে পড়াশোনা করেছেন বাংলাদেশের বৃত্তি নিয়ে। বহু সংস্থা-সংগঠন, পেশাজীবী ও সেবামূলক সংস্থার সাথে তাঁর সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। তিনি SAARC এজমা এসোসিয়েশনের সভাপতি, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স এসোসিয়েশন (BPMPA) এর বর্তমান সভাপতি ছাড়াও সুশীল সমাজের প্লাটফরম টিআইবি-সনাকের দায়িত্বশীল সংগঠক তিনি। চট্টগ্রামের পাঠকধন্য দৈনিক আজাদীতে 'ভূগোলের গোল' শিরোনামে নিয়মিত কলাম লিখে আসছেন। ডা. কিউ এম অহিদুল আলমের পিতা মরহুম জামাল আহমদ সওদাগর ছিলেন চট্টগ্রাম হাটহাজারীর তৎকালীন জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ ও প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি। যিনি ১৯৫১/৫২ সন থেকে কাটিরহাট ইউনিয়নের দীর্ঘকাল নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে ছিলেন। পিতা জামাল আহমদ সওদাগর মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ও দরবারের বুযুর্গ ব্যক্তিত্বদের প্রতি অতীব শ্রদ্ধা-ভক্তি পোষণ করতেন। সেই সুবাদে মাইজভাণ্ডার শরীফের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে বেড়ে উঠেন ডা. কিউ এম অহিদুল আলম। অছিয়ে গাউসুল আ'যম হযরত মাওলানা শাহসূফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং পরবর্তীতে এসে বিশ্বঅলি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর সান্নিধ্যের সুযোগ পান তিনি। দরবারের মহাত্মাদের নানা বিষয় ও শাহানশাহ হুযুর (ক.) সম্পর্কে বহু ঘটনা স্মৃতি তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডারে মওজুদ। মাসিক আলোকধারার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তা তিনি তুলে ধরেছেন অকপটে খোলাখুলিভাবে। তাছাড়াও দেশের বিদ্যমান নানা পরিস্থিতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়-আশয়ের ওপর তাঁর পর্যবেক্ষণও উঠে আসে আলাপচারিতায়। গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ শনিবার বিকেলে চট্টগ্রাম মহানগরীর পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকাস্থ (মক্কী মসজিদ ও হেলথ কেয়ারের পেছনে) নিজ বাসভবন ও চেম্বারে আলোকধারার পক্ষে ডা. কিউ এম অহিদুল আলমের মুখোমুখি হন সংবাদকর্মী আ ব ম খোরশিদ আলম খান। এ সময় আরো ছিলেন আলোকধারার মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান আশরাফ ও মুহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন। আলাপের চুম্বক অংশ পাঠকের আয়নায় মেলে ধরা হলো।

'চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি নানুপরের একজন রাজনীতিবিদকে শাহানশাহ হুযুর একদিন আক্ষেপের সুরে বললেন, আঁর কাছে বেয়াঙ্গুন আইয়্যিদে খালি দুনিয়া চাইবাল্লায়, কেউ আখিরাত চাইতো নো আইয়্যি'

বিশ্বঅলি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সম্পর্কে নানান স্মৃতি ও ঘটনার কথা বলতে গিয়ে এক পর্যায়ে জনাব ডাঃ কিউ এম অহিদুল আলম জানালেন, চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি নানুপরের বাসিন্দা শিক্ষিত ভদ্রলোক ও রাজনীতিবিদ এক ব্যক্তির কাছ থেকে শোনা শাহানশাহ হুযুরের বিশেষ উক্তির কথা। বিশেষ কারণে ওই ব্যক্তির নাম প্রকাশ না করেই ডাক্তার সাহেব বললেন, আমার ঘনিষ্ঠ নানুপুরের প্রভাবশালী এই রাজনীতিবিদ একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে জানালেন তিনি একবার শাহানশাহ হুযুরের একান্ত সাক্ষাৎ পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। নানা রহস্যপূর্ণ তাৎপর্যময় কালাম করেছিলেন শাহানশাহ হুযুর। একপর্যায়ে নানুপুরের ওই লোকটির সামনে শাহানশাহ হুযুর আক্ষেপের সুরে বলে উঠলেন, 'হদুয়ুন মানুষ, আঁর কাছে বেয়াঙ্গুন আইয়্যিদে খালী দুনিয়া চাইবাল্লায়, কেউ আখিরাত চাইতো নোআইয়্যি' (আমার কাছে সকলেই আসেন দুনিয়া তথা পার্থিব উন্নতির আশায়, কেউ অনন্ত জীবন আখিরতে মুক্তির আশায় আসেনা) শাহানশাহ হুযুর উক্ত আক্ষেপ ও দুঃখমিশ্রিত কথা অবশ্যই গুরুত্বের দাবি রাখে। সাক্ষাৎ ও দোয়াপ্রার্থী মানুষের ইচ্ছা-বাসনা ও অভিপ্রায়ই এই একটি বাক্যে ফুটে উঠেছে বলে মনে করেন ডাঃ কিউ এম অহিদুল আলম সাহেব। একজন মানুষকে কিসের ওপর বেশী জোর দিতে হবে তা যেমন শাহানশাহ হুযুরের বাণীর মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়, তেমনি অধিকাংশ মানুষের বৈষয়িক উন্নতি তথা দুনিয়ার প্রতি অতি আসক্তি ও মোহ দেখে তাঁর অসন্তুষ্টি ও আক্ষেপই ধ্বনিত হয়েছে উক্ত মন্তব্যে। কেবল দুনিয়াবি চিন্তায় ডুবে থাকা যে

মানুষের জন্য ক্ষতিকর তাও শাহানশাহ্ হুযুরের কথায় সুস্পষ্ট আঁচ করা যায় বলে মনে করেন ডাঃ অহিদুল আলম।

বঙ্গবন্ধু-জিয়া-এরশাদ সরকারের আমলে সরকারি বৃত্তি নিয়ে প্রায় ৩০ হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী বিদেশে পড়াশোনা করেছে। তাদের অধিকাংশই আর দেশে ফিরে আসেনি। মূলত একারণেই প্রশাসনসহ দেশের সকল স্তরে যোগ্য লোকের সংকট দেখা দিয়েছে। দক্ষ জনসম্পদের অনুপস্থিতি ও মেধা পাচার চলতে থাকায় আজ দেশ ও জাতি চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে।

মেধা পাচার, দক্ষ জনসম্পদের অনুপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ পদে অযোগ্য-অক্ষমদের অবস্থান এবং সঠিক জায়গায় সঠিক লোকনা থাকায় আজ দেশে গভীর শূন্যতা বিরাজ করছে বলে দাবী করেছেন ডা. কিউ এম অহিদুল আলম আলাপচারিতায় তিনি এ দাবির সপক্ষে বাস্তব কিছু উদাহরণ পেশ করেন। তিনি জানান, বঙ্গবন্ধু সরকারের আমল থেকে জিয়া-এরশাদ সরকারের শাসনামল পর্যন্ত দীর্ঘ দুই-আড়াই দশক ধরে দেশের স্কুল-কলেজ এসএসসি-এইচএসসিতে কৃতিত্ব অর্জনকারী ডাবল স্ট্যান্ড প্রাপ্ত অতি মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে বাংলাদেশের সরকারি বৃত্তি দিয়ে বহু দেশে পড়শোনার জন্য পাঠানো হয়েছিল। প্রশাসন, কৃষি, কেমিস্ট্রি, ডাক্তারিসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর উচ্চ শিক্ষার্থীরা বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা ও ডিগ্রী অর্জন করে। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্য ও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, তিন সরকারের আমলে বৃত্তি নিয়ে বিদেশে পড়াশোনাকারী দেশের কৃতী শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে আর দেশেই ফিরে আসেনি। এরা বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নেয়ার পর সেখানে থেকে যায় এবং বিদেশেই কর্মজীবন শুরু করে। ফলে সেরা মেধাবী ও কৃতী শিক্ষার্থীদের সেবা থেকে দেশ বঞ্চিত হয়। মূলত এ কারণেই আজ দেশের প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সেবাসহ সকল ক্ষেত্রে যোগ্য লোকের সংকট বিরাজ করছে। উপযুক্ত জায়গায় উপযুক্ত মানুষকে বসানো যায়নি বলেই দেশে এক ধরণের শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে কেউ ভাবেননি।

বাংলাদেশ সরকারের বৃত্তি নিয়ে বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রি নেয়া সেরা মেধাবী শিক্ষার্থীরা দেশে আর ফিরে না আসার কী কারণ জানতে চাইলে বুলগেরিয়া থেকে সরকারি বৃত্তি নিয়ে এমবিবিএস পাস করা ডাক্তার কিউ এম অহিদুল আলম বলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীরাই বিদেশে বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করলেও দেশে ফিরে এসে ভালো উপযুক্ত চাকরিতে তাদের পদায়নের ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থাই কোনো সরকার করতে পারেনি। দেশের টানে দেশবাসীর প্রতি দায়বদ্ধতার কথা মনে রেখে বিদেশে বৃত্তি নেয়া কিছু শিক্ষার্থী দেশে ফিরে আসলেও তারা নানাভাবে নিগৃহীত ও বঞ্চিত হয়েছে। প্রশাসনে, শিক্ষাঙ্গনে, মেডিকেলসহ তারা নানা ক্ষেত্রে চাকরি নেয়ার চেষ্টা করলেও অনেকেই ভালো চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অধিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে গিয়ে বহু মেধাবী শিক্ষার্থী পদে পদে বিড়ম্বনা, হয়রানির শিকার হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থী দেশে ফিরে আসার পর তাদের কোথায় কীভাবে চাকরি দেয়া হবে এর কোনো নীতিমালাই সরকারগুলো করতে পারেনি। ফলে মেধাবী সেরা সন্তানদের সেবা থেকে দেশ বঞ্চিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের বৃত্তি নিয়ে বিদেশে উচ্চ ডিগ্রি নেয়া এবং পরবর্তীতে দেশের টানে ফিরে আসা কিছু কীর্তিমান ব্যক্তির উদাহরণ টেনে ডাঃ অহিদুল আলম সাহেব বলেন, বর্তমান জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান, গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ-সিপিডির ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, ঢাকা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডাঃ প্রাণ গোপাল দত্তসহ এ ধরণের কিছু ব্যক্তি পূর্ব ইউরোপে উচ্চতর পড়াশোনা করে দেশে ফিরে এসেছেন। ওরা তখনকার সবচেয়ে মেধাবী ও সেরা শিক্ষার্থী ছিল বলেই আজ কর্মজীবনে এসে ওরা নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছেন। ওদের কল্যাণে দেশ ও জাতি আজ বহুভাবে উপকৃত হচ্ছে। যদি বিদেশে উচ্চশিক্ষা নেয়া সবাইকে দেশে ফিরিয়ে আনা যেতো তবে তাদের মেধা ও কর্মদক্ষতায় দেশবাসী বহুভাবে উপকৃত হতো বলে মনে করেন ডাঃ কিউ এম অহিদুল আলম।

অনেক মেধাবী কৃতী শিক্ষার্থী বিদেশে পড়াশোনা করে দেশে ফিরে এসে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে গিয়ে বহুধরণের হয়রানি ও হেনস্থার শিকার হয়েছে উল্লেখ করে ডাঃ অহিদুল আলম বলেন, বর্তমানে বিদেশের ওহাইও বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রফেসর ড. শেখ আলী আকবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির আবেদন করেছিলেন। অথচ তাঁকে উপেক্ষা ও হেনস্থা করে ঢাবিতে চাকরি দেয় হয়নি। পরবর্তীতে দুঃখে-ক্ষোভে-অভিমানে তিনি বিদেশে চলে যান। এখন তিনি বিশ্ববিখ্যাত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রফেসর হলেও এমন একজন যোগ্য দক্ষ ব্যক্তিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দিতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

একইভাবে বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে কর্মসংস্থানের জন্য ফিরে আসা কক্সবাজারের ডাঃ আমান উল্লাহ বাংলাদেশের কোনো মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চাকরির ব্যবস্থা করতে না পেরে আমেরিকায় চলে যান। তিনি সেখানে এখন নামকরা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। এমনকি ডাঃ আমান উল্লাহ বিল ক্লিনটনের ব্যক্তিগত

চিকিৎসক পর্যন্ত হয়েছেন। অথচ এমন কৃতী গুণী মানুষটিকে আমরা দেশে ধরে রাখতে পারিনি। বাংলাদেশের বৃত্তি নিয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী কৃতী মেধাবী শিক্ষার্থীদের দেশে কীভাবে কোন্ কোন্ জায়গায় পোস্টিং দেয়া হবে তা নিয়ে ১৯৭৫ সনে বঙ্গবন্ধু সরকার একটি নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নিলেও হঠাৎ বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর কারণে সে উদ্যোগ ভেঙ্গে যায় বলে জানান ডাঃ কিউ এম অহিদুল আলম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৯৭২ সন থেকে রাশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে দেশের বহু কৃতী শিক্ষার্থীকে পড়াশোনার জন্য পাঠানো হয়। ১৯৭৫ সনের শুরুর দিকে রাশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শামসুর রহমান খান (সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্টারিয়ান আতাউর রহমান খান এর ভাই) বাংলাদেশের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আলীকে বললেন, বৃত্তি নিয়ে রাশিয়ায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা তো দেশে ফেরার সময় হচ্ছে। তাদের তো চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা করা দরকার। কে, কোথায়, কীভাবে চাকরি করবে এর একটা নীতিমালা করা দরকার বলে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত শামসুর রহমান ও শিক্ষামন্ত্রী জনাব ইউসুফ আলী এ বিষয়ে একমত হলেন। বিষয়টি তৎকালীন দেশের কর্ণধার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নজরে আনা হলে তিনি শীঘ্রই একটি নীতিমালা তৈরির নির্দেশ দেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এরপর পরই বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক মৃত্যু হলে নীতিমালা তৈরির কাজ আর এগোয়নি। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জিয়া ও এরশাদ সরকারের আমলেও বহুল প্রত্যাশিত ও অতি জরুরি এ নীতিমালা তৈরির বিষয়টি প্রাধান্য পায়নি। ফলে এভাবে বাংলাদেশ তার সেরা ও কৃতী সন্তানদের সেবা ও কর্মদক্ষতা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। মেধাবী সন্তানদের দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হলে দেশ ও জাতি আজ এমন দুরবস্থার মুখোমুখি হতো না বলে মনে করেন ডাঃ কিউ এম অহিদুল আলম।

'বুলগেরিয়া থেকে ডাক্তারী পাস করে দেশে ফিরে আসার পর কয়েক বছর ধরে দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চাকরি পেতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় কিছু হয়নি। একদিন শাহাশাহ্ হুযুরের কাছে চাকরী পাবার দোয় চাইলে তিনি বললেন, 'অনত্তে সরকারী চাকরি ন লাইবো, এখন যেন আছন, ভালা আছন'। কী আশ্চর্য, শাহানশাহ্ হুযুরের কথামতো কোনো নির্দিষ্ট চাকরি ছাড়াই শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্র্যাকটিস করেই আমি জীবন কাটিয়ে দিয়েছি। ইনশাআল্লাহ্, চাকরি না করা সত্ত্বেও আমি অনেক ভালো আছি'।

বাংলাদেশ সরকারের বৃত্তি নিয়ে ১৯৭৩ সনে বিদেশে গিয়ে বুলগেরিয়া সোফিয়া মেডিকেল একাডেমী থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি নেয়ার পর ১৯৮৫ সনে দেশে ফিরে আসেন ডাঃ কিউ এম অহিদুল আলম সাহেব। দেশে ফিরেই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে চাকরি পেতে বারবার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন তিনি। তখন দেশের প্রচলিত আইনে তাকে নিম্নতম পদ দিয়ে চাকুরী শুরু করার প্রস্তাব করা হয়। এক সময়ে তিনি মাইজভাণ্ডার শরীফে জিয়ারতের জন্য যান। বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর কাছে চাকরির সমস্যার কথা বলে দোয়া চান তিনি। কিন্তু শাহানশাহ্ হুযুর সরকারী চাকরি তালাশে নিরুৎসাহিত করে তাকে বললেন, 'অনত্তে সরকারী চাকরি ন লাইবো, এখন যেন আছন, খুব ভালো আছন' (আপনার সরকারী চাকরির প্রয়োজন নেই, এখন যেভাবে আছেন, ভালোই আছেন)। সত্যি সত্যি সরকারী কোনো চাকরি ছাড়া জীবনের ৬০টি বছর কেটে গেছে ডাক্তার সাহেবের। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি প্রায় তিন দশক ধরে আমার ব্যক্তিগত চেম্বারে রোগী দেখে আসছি। এভাবেই প্রতিষ্ঠিত আমি। সরকারী চাকরি করলে দেশের নানা জায়গায় পোস্টিং হতো। অনেক ঝামেলা-বিড়ম্বনার মুখোমুখি হতাম। ছেলে সন্তানদের মানুষ করতে পারতাম না। এখন বুঝতে পারছি, সরকারী চাকরির চেয়ে এখন যেভাবে আছি, তাই আমার জন্য অধিক মঙ্গল। বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) আমার ভবিষ্যৎ কেমন হবে তারই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন বহু আগেই। তাঁর কথাই আমার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। এভাবে শাহানশাহ্ হুযুরের দিক নির্দেশনার গভীর তাৎপর্য দিনে দিনে বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন ডাঃ কিউ এম অহিদুল আলম।

পূর্ববর্তী সংখ্যার সংশোধনী

১. আমি সস্ত্রীক গ্রামে যাই। এখানে আমি বলতে ডাক্তারের বাবা জামাল সওদাগর এর কথা বোঝানো হয়েছে। ঘটনাটা ডাক্তার সাহেবের প্রয়াত বাবার সাথেই ঘটেছিল।

২. ডাক্তার সাহেবের দাদা খলিলুর রহমান খলইয়ের ১৯৩৫ সনের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন – চেয়ারম্যান নন।

রমেশ শীলের ফকিরিতে মৌলানা রূমীর প্রভাব

॥ মোঃ গোলাম রসুল ॥

রমেশ শীলের জন্ম চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর পূর্ব গোমদণ্ডীতে ২৬ বৈশাখ, ১২৮৪ বাংলা (১৮৭৭ খ্রিঃ) এবং মৃত্যু ২৩ চৈত্র ১৩৭৩ বাংলা অর্থাৎ ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি বাবা ভাণ্ডারী হযরত শাহসুফি মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন এবং দীক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি সংসার করেছেন, গান লিখেছেন, গান গেয়েছেন এবং বিভিন্ন সম্মাননা ও একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু ফকিরি ছাড়েন নি। যেমন- মাইজভাণ্ডার শরীফের আউলিয়াগণ সংসার করেছেন অথচ ফকিরি ছাড়েন নি। তাঁদের নিকট থেকেই রমেশ শীল ফকিরি পেয়েছেন। হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ), হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান (কঃ), হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এবং শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সংসার ধর্ম পালন করেছেন; অপরপক্ষে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌তে বিলীন হয়েছিলেন। ফলে সর্বকালে সর্বদিকে তাঁদের প্রচারিত ত্বরীকা বিরাজমান আছে এবং থাকবে। এ ব্যাপারে কারো সন্দেহ করা চলবে না, বা চলছে না।

১৯৯৬ সালে আরাফাতের ময়দান থেকে মেজদালেফা যাওয়ার পথে বাসের ভিতর বগুড়া জেলার একজন মৌলবী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে আবার মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার দরকার কী?" উত্তরে আমি বলেছিলাম, "মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকা ইসলাম ধর্মের অনুশীলন করে এবং ইসলামের আহ্‌কাম ও বৈশিষ্ট্যকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যাপৃত থাকে।" তখন তিনি আর কোন প্রশ্ন করেন নি। বর্তমানে সংঘাতময় পৃথিবীতে এবং সহিংস কার্যকলাপ কেবল অশান্তি বৃদ্ধি করছে। তাই শান্তির জন্য মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার প্রবক্তাগণ অহর্নিশ সাধনা করে গেছেন।

রমেশ ফকিরও শান্তি খোঁজার জন্যই ফকিরি ত্যাগ করেন নি। মহান আল্লাহ্ কুরআন পাকে বলেছেন- "যারা খোদায় বিশ্বাসী এবং যারা ইহুদী, নাসারা বা ছাবিয়ান যে হোক না কেন, যদি তারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য করে, তার পুরস্কার আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট রক্ষিত আছে। তাদের কোন ভয়ভীতি এবং অনুতাপ নেই।" - সূত্রঃ (সূরা বাক্বারাঃ আয়াত-৬২)।

তাই রমেশ ফকির আল্লাহ-প্রেমে মত্ত ছিলেন। মাইজভাণ্ডার শরীফও সকল মানুষের মিলনকেন্দ্র এবং আল্লাহ্-প্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ। আধ্যাত্মিক জগতে ত্বরিকতের ৪ (চার)টি স্তরের কথা উল্লেখ আছে - যার সম্বন্ধে রমেশ শীল অবহিত ছিলেন। যেমন মৌলানা রূমী (রহঃ) বলেন-

বরাহে তর বিয়ত পীরা বশারত
বদা দাহ্ চার চিজ্ মনজিল্ বা এবারত।
একে মনজিল্ কে আ নাছুত্ নামাস্ত
পোর আজ্ আও চাপে হায় ওনি তামামাস্ত
আজাঁ মনজিল্ আগর্ খোদ বগুজরদ্ কচে
দওম মন্‌জিল রছদ্ ত ঝা মলক্ বচে
চুঁ বর্ গিরদ্ কদম রা ত জেমলকুত্
রছদ্ দর্ মন্‌জিলে ছ ওম্ বজবরুত্
চুঁ গর দদ্ জান্ ও দিল আজ গায়ের হক্ পাক্
রছদ্ দর আলমে লাহুদ্ বেবাক্ ।

অর্থাৎ তরিকতের পথের জন্য পীর একটি সুসংবাদ দিয়েছেন; এই সুসংবাদ হলো ৪টি স্তরের এবাদত। একটি স্তরের নাম "নাছুত"- যা পশু প্রকৃতিতে পরিপূর্ণ। এই স্তর হতে কেউ যদি অগ্রসর হতে পারে, সে দ্বিতীয় "ফেরেশ্‌তার স্তরে" চলে যায়। ফেরেশ্‌তার স্তর হতে যখন সে পা বাড়ায়, সে "জবরুত" নামক স্তরে পৌঁছে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য জিনিসের প্রতি আসক্তি থেকে সে যখন মুক্তি পায়, সে তখন ভয়-ভীতি হীন "লাহুতের" স্তরে পৌঁছে যায়। তাই রমেশ শীল বলেন-

"মাঝি ত্রিবেণী ঘাটের জোয়ার ধরে যাইও।
ভাণ্ডারীর বরজকে তরী ধীরে ধীরে বাইও।
প্রথম ঘাট নাছুতের বাজার হুঁশিয়ারে রইও।
সেই ঘাটে ডাকাইতের মেলা মূল হারাইবা চাইও।
তার পরে মূলকুতের সহর দিশা ঠিক রাখিও।
ডানে বামে চন্দ্র সূর্য্য মধ্য দি চলিও।
যব্রুতে বাতাসের খেলা বাদাম উঠাই দিও।
নিলক্ষের বাক্ দৃষ্টি করি ছুপানটি ধরিও।
শেষে পীর মুরিদে এক রং ধরি আনন্দে কাটাইও।

পাঠক অবশ্যই অনুধাবন করছেন, রমেশ ফকির সেই সব কথাই বলেছেন, যা ফকির সমাজের রহস্যের জালে ঘেরা। ফকির ছাড়া অন্য কেউ এটা অবগত নয়। রমেশ শীল সিরাজ বাবা থেকে মৌলানা রূমীর যে ছবক পেয়েছিলেন তা "এশ্কে সিরাজিয়ার" ৮ নং গানে নিম্নরূপ লিখেছেন-

"আমার মালিকের কত ঘর, দেখতে কত মনোহর
কত খেলা তাহার ভিতর দেখবি কে কে আয়
আগুন জল বাতাস মাটি, তার ভিতর সোনার বাটি
সেই বাটিতে খাঁটি মওলা দোলনা খেলায়,
ছয় কামরা নীচে চার উপরে দুই চমৎকার,
বিনা তারে বীণা ঝংকার শব্দ শুনা যায়,
প্রথম কামরায় কাল নাগিনী তার উপর ছাকা পানি,
তার উপর আগুনের খনি, উর্ধ দিকে ধায়

তার উপর বাতাসের ঘর হু হু করে নিরন্তর।
যেন গুঞ্জরে ভ্রমর মধু পানি আশায়
রূহ ছের আখ্‌ফা খাকি এই চার নারী বহুরূপী
আর দুই নারী উপরে বসে দুই তহশীল দারে
জমা খরচ হিসাব লিখে বিরাম নাহি তায়।
লাহুতের তালা খুলি রূপধন গেলে চলি
হালেতে এই সেই এক হয়ে যায়।

এভাবেই রমেশ ফকির ফকিরদের ছয় লতিফার সাহায্যে ধ্যান করার বিস্তারিত নিয়ম-কানুন রপ্ত করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে নকশ্‌ বন্দিয়া ত্বরীকা মোতাবেক জিকির করার জন্য ছয় লতিফার উল্লেখ আছে। "লতিফা" শব্দটি আরবী বা ফার্সিতে ব্যবহার হয়, এর অর্থ সূক্ষ্ম বস্তু। অনেক পণ্ডিত লতিফাকে নারীর সংগেও তুলনা করেন। লতিফাগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১। লতিফায়ে কলব্‌ - এটি বাম স্তনের দুই আংগুল নীচে আছে।
২। লতিফায়ে রূহ্‌ - এটি ডান স্তনের দুই আংগুল নীচে আছে।
৩। লতিফায়ে ছের্‌ - এটি বুকের উপরিভাগে অবস্থিত।
৪। লতিফায়ে নফস্‌ - এটি নাভীর নীচে অবস্থিত।
৫। লতিফায়ে খফি - এটির অবস্থান কপালে।
৬। লতিফায়ে আখ্‌ফা - এটির অবস্থান মাথার চান্দির নীচে।

ছয় লতিফার দ্বারা বিভিন্নভাবে "আল্লাহু আল্লাহু" জিকির করার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত তৈরী হয়। মৌলানা রুমী (রহঃ) তাঁর মসনবী শরীফে উল্লেখ করেছেন-

"আল্লা আল্লা গোস্ত আল্লা মিশওদ
ইছখুন কায় বিল্লুরে মরলুম্‌ শওদ"

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ জপতে জপতে মানুষ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিলীন হয়।

রমেশ শীল ফকিরি করতে হলে কিভাবে সাধন করতে হয় তা নিম্নলিখিত গানে বর্ণনা করেছেন-

"সাধনে কায়দা জানা চাই
বেকায়দায় করিলে সাধন মওলা রাজী নাই।
হালকা করা যিকির করা, তরিকতের নামাজ পড়া
না জেনে ভজনের ধারা নাচের মুরদ নাই।।
প্রথমে গুরু বানাবে, তারপরে নিয়ত বাঁধিবে
আদবেতে সোজানু পাতিয়া বস ভাই।।
তারপরে দরুদ পড়, পীরের বর্জখ ধর
আল্লাহ্‌ জিকির কর, তালেতে মিশাই।।
ডানে লই বামে ছাড়িলে, এক্কে কলব ঝাংকারিলে
নাচনা কর মজনু হালে শখ শোভা তার নাই।।
হালকা করা শেষ হইলে, মুনাজাত মাগিয়া নিলে
রমেশ কয় মনকেরের দল থাকবে মুখ খিলাই।।

সেই জন্যই রমেশ পুনরায় গেয়েছেন-

"চলরে মন ত্বরায় যাই
বিলম্বের আর সময় নাই
গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী স্কুল খুইলাছে।

শাহানশাহ্‌ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট -এর ব্যবস্থাপনায় দিনব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ২৩ মার্চ শনিবার নগরীর বিবিরহাটস্থ গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ্‌ শরীফ মিলনায়তনে শাহানশাহ্‌ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট -এর ব্যবস্থাপনায় দিনব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ট্রাস্ট পরিচালনাধীন মাদ্‌রাসা-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (আলিম) এবং উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানা সহ মোট ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ অন্যান্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্মশালা সমন্বয়ক ছিলেন চট্টগ্রাম টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রাক্তন ভাইস প্রিন্সিপাল প্রফেসর আবদুল্লাহ-আল-মাহমুদ। প্রশিক্ষণে উল্লেখযোগ্য বিষয়ে মধ্যে ছিল- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা নিরূপণ ও সমাজ উন্নয়নে এর ভূমিকা, প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় টিম গঠনের গুরুত্ব, প্রশিক্ষণ ও দায়িত্ব বন্টন, জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ার, দায়িত্ব ও কর্তব্য, শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা ও নিপুনতা (Skill), শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিখন, দক্ষতা, শেখার শর্তসমূহ (রোল মডেল), শিশু শিক্ষার আধুনিক কলাকৌশল, শিশু মনোবিজ্ঞান, দাপ্তরিক কাজকর্মে চিঠিপত্র/প্রতিবেদন লিখন পদ্ধতি - যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা, জনসম্পদ, জনসম্পদ উন্নয়ন, মানবসম্পদ এবং কুরআন-হাদীসের আলোকে সমাজ উন্নয়নে নারীর মর্যাদা ও গুরুত্ব। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন চবি মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সৈয়দ মাহাম্মদ সাজ্জাদ কবির, প্রফেসর আবদুল্লাহ্‌-আল-মাহমুদ, ট্রাস্ট সেক্রেটারী এ এন এম এ মোমিন এবং মুফতি অলিউল্লাহ্‌ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুল হোসাইন মাইজভাণ্ডারী।

মাদরাসা-এ-শাহানশাহ্‌ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

মাদ্‌রাসা এ শাহানাশাহ্‌ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী রবিবার চিত্রাঙ্কন, নাত কেরাত প্রতিযোগীতা ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান হামজরবাগ গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ্‌ শরীফের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল হলিম সওদাগরের সভপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ডা. বরুন কুমার আচার্য্য (বলাই) মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান টুটুল, এস এম মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ জেবল হোসেন। অনুষ্ঠানে মাদরাসা এ শাহানশাহ্‌ হযরত জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস।

মধ্যম ধর্মপুর দায়মোল্লা তালুকদার বাড়ী শাখার উদ্যোগে মাইজভাণ্ডারী সম্মেলন সম্পন্ন

গত ২০ ফেব্রুয়ারি '১৩ বুধবার মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ মধ্যম ধর্মপুর দায়মোল্লা তালুকদার বাড়ী শাখার উদ্যোগে শাখার প্রতিষ্ঠাতা রফিকুল আলম এর বাসভবনে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) ও বিশ্বঅলি শাহানশাহ্‌ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র স্মরণে এক আজিমুশশান **মাইজভাণ্ডারী সম্মেলন** অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মির্জাপুর দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন সৈয়দ মহিউল করিম মির্জাপুরী সাহেব। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বঅলি হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র রওজা শরীফের খাদেম হাফেজ মাওলানা আবুল কালাম সাহেব, বিশেষ বক্তা নদিমপুর সৈয়দীয়া ইন্সুহিয়া মাদ্রাসার সুপার মাওলানা মুঃ তরিকুল ইসলাম ও দক্ষিণ ধর্মপুর রহমানিয়া মাদ্রাসার আরবী মুদাররিছ মাওলানা কুতুব উদ্দিন আলকাদেরী। মাহফিল শেষে দেশ ও জাতির শান্তি কামনা করে আখেরী মোনাজাত পরিচালনা করেন মির্জাপুর দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন সৈয়দ মহিউল করিম মির্জাপুরী।

সৈয়দ নগর শাখার 'শানে মাইজভাণ্ডারী তুরিকত সংলাপ' অনুষ্ঠিত

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ সৈয়দ নগর শাখার উদ্যোগে 'শানে মাইজভাণ্ডারী তুরিকত সংলাপ' ও ফাতেহা ইয়াজদাহুম উপলক্ষে এক মিলাদ মাহফিল ছদরুল আলমের সভাপতিত্বে গত ২২ ফেব্রুয়ারী, জনাব আজিজ ভাণ্ডারীর বাড়ীতে, হক ভাণ্ডারী দাদরা শরীফ প্রাঙ্গনে, বাদে মাগরিব অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গবেষক জনাব আবুল মনসুর খান। বক্তব্য রাখেন আবদুল আজিজ ভাণ্ডারী, মাওলানা ছাবের আহম্মদ কুতুবী, হাজী মোস্তফা কামাল, আবু সিদ্দিক, মোঃ নাছের কোম্পানী, মোঃ সেকান্দর, মোঃ ইব্রাহিম খলিল, মোঃ সোহেল, মোঃ ফোরকান প্রমুখ। মিলাদ কিয়াম করেন, হাফেজ মোঃ নুরুল হক। সভায় আগামী ১৫ মার্চ কমিটির উদ্যোগে খাজা গরীবে নেওয়াজ (কঃ) ও শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র বার্ষিক ফাতেহা উপলক্ষে এলাকার গরীব-দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদের খতনা ও কর্ণ ছেদ অনুষ্ঠান এবং মিলাদ মাহফিলে সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়।

সাতগাউছিয়া দরবার শরীফের পীরানে পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর খোশরোজ শরীফ ও ওয়ারেছ বিল্লাহ সুলতান পুরীর বেছাল বার্ষিকী ওরশ সম্পন্ন

পটিয়ার সাতগাউছিয়া দরবার শরীফে গত ১মার্চ ২০১৩ বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর পবিত্র খোশরোজ শরীফ এবং ওয়ারেছ বিল্লাহ্ সুলতানপুরীর বেছাল বার্ষিকীসহ মুজিবউল্লাহ, মোজাহেরুল্লাহ ও মতিউর রহমান (র.) এর ওরশ শরীফ কানুন বিল্লাহর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ওরশ শরীফ উপলক্ষে হুজরা শরীফ প্রাঙ্গণে ইসলামের প্রচার প্রসার নিয়ে ও অলিয়ে কেরামগণের জীবনী নিয়ে আলোচনা সভা ও জিকির মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওলাদে সুলতানপুরী আলহাজ্ব নুরুল আতাহার বিল্লাহ (কানুন) সুলতানপুরী। বিশেষ মেহমান ছিলেন জনাব সাইফুল্লাহ সুলতানপুরী ও মনছুর উল্লাহ সুলতানপুরী। বক্তাগণ বলেন ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তারই ধারাবাহিকতায় পীরানে পীর দস্তগীর ও আওলাদে রাসূলগণ বা অলিয়ে কেরামগণ ইসলাম প্রচারে অনবদ্য ভূমিকা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম। তাই বিশ্বের সকল মুসলমানদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন এই শান্তির ধর্ম প্রচারে এগিয়ে আসা আওলাদে রসূলগণদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য। পরিশেষে বিশ্বশান্তি ও কল্যাণের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আখেরী মোনাজাত ও তবারুক বিতরণ করা হয়। আখেরী মোনাজাত পরিচালনা করেন আওলাদে সুলতানপুরী আলহাজ্ব নুরুল আতাহার বিল্লাহ (কানুন) সুলতানপুরী।

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ বৃন্দাবন চৌধুরী হাট শাখা

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ বৃন্দাবন চৌধুরীহাট শাখার উদ্যোগে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) এবং খাজা গরীবে নেওয়াজ এর বার্ষিক ফাতেহা উপলক্ষে বিশ্বঅলি শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ১৪তম চান্দ্র বার্ষিক ফাতেহা উদযাপন উপলক্ষে এক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন, মাওলানা মোহাম্মদ ওয়াহিদুল আলম, মাওলানা জহিরুল আলম, আবুল মনছুর খান, হাফেজ আবুল কাসেম, মাওলানা মোহাম্মদ সেলিম।

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ সূর্যগিরি আশ্রম শাখার সাধারণ সভা ও ২২ চৈত্র ওরশ প্রস্তুতিসভা সম্পন্ন

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ সূর্যগিরি আশ্রম শাখার উদ্যোগে ১৬ মার্চ শনিবার সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে সূর্যগিরি আশ্রমের অস্থায়ী কার্যালয়ে আশ্রমের সাধারণ সভা ও ২২ চৈত্র ১৪১৯ বঙ্গাব্দ ৫ এপ্রিল ২০১৩ বাবা ভাণ্ডারীর ওরশ প্রস্তুতি সভা সূর্যগিরি আশ্রমের সভাপতি ডাঃ বরুন কুমার আচার্য্য (বলাই)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা আসন্ন ২২ চৈত্র বাবা ভাণ্ডারীর ওরশ পালন প্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনা করেন। বক্তারা বলেন- মানব সম্প্রদায়কে বিভিন্ন সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য যুগে যুগে আউলিয়া মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হয়েছে। তদ্রূপ মানব জাতিকে মহাসংকট থেকে উত্তরন করার জন্য গাউসুল আযম বিল বেরাসত শাহসূফি মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারীর আবির্ভাব ঘটেছে। অনেক মানুষ জাগতিক সমস্যা সমধানের জন্য ও জ্ঞানী ফয়েজ লাভের জন্য বাবা ভাণ্ডারীর দরায় ধন্য হয়েছেন। এছাড়া মহান ওরশ শরীফে সংগঠনের সকল সদস্যদেরকে ওরশ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমূহে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয় এবং মাইজভাণ্ডারী মুখপত্র মাসিক আলোকধারা প্রচার ও পাঠে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। উক্ত আলোচনা সভায় সাধারন সম্পাদক দীমান দাশ, অর্থ সম্পাদিকা শিপ্রা বসু মল্লিক, সহ-অর্থ সম্পাদক ছোটন ধর, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক মাইকেল দে, প্রচার সম্পাদক বাবন চৌধুরী, সহ-দপ্তর সম্পাদিকা শশী মহাজন, নির্বাহী সদস্য সুমন দাশ, উত্তম দাশ, কৃষ্ণ বৈদ্য, মোঃ জামাল, অতি বসু মল্লিক, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ মান্জি শাহ্ (রঃ) ওরশ শরীফ ও ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) অনুষ্ঠিত

বোয়ালখালী পৌরসভা পূর্ব গোমদন্ডী মুফতি পাড়া হযরত শাহসূফি মাওলানা সৈয়দ মান্জি শাহ্ (রঃ)-এর বার্ষিক ওরশ শরীফ উপলক্ষে ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ), খতমে কুরআন, ফাতেহা শরীফ, তবরুক বিতরণ, আল্লাহর রাসূল, আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনী নিয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারী মহাসমারোহে মাজার প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাজার কমিটির সভাপতি খদেম আল্ সিরাজ ভাণ্ডারীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ জসিম উদ্দিনের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম গোমদন্ডী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আবুল কালাম আবু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনুচিয়া শাহ্ মজিদিয়া দাখিল মাদ্রাসার সিনিয়ার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন আল কাদেরী, উত্তর গোমদন্ডী আল আমিন জামে মসজিদের খতিব আলহাজ্ব মাওলানা তাজুল ইসলাম নোমানী। কধুরখীল উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ জমির উদ্দীন, গোমদন্ডী ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ গোমদন্ডী শাখার সহ-সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, সহ-সভাপতি এম এস আলম, ডা. এম এ রহিম চৌধুরী, মোঃ আবুল খালেক সওদাগর, মোঃ শহিদুল্লাহ, আবদুল গফুর, আবদুর সবুর, মোঃ মহিউদ্দীন, মোঃ সালাউদ্দীন ও আবদুল মোতালেব। আখেরী মুনাজাত পরিচালনা করেন সৈয়দ আহসান উল্লাহ্ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর হক আনোয়ারী প্রমুখ।

মুফতিয়ে আজম হযরত মাওলানা মছিহ উল্লাহ্ মির্জাপুরীর (কঃ) বার্ষিক ওরশ শরীফ সম্পন্ন

গত ১৮ মার্চ হাটহাজারী মির্জাপুর সৈয়দ পাড়া গাউসিয়া মছিহ মন্জিল, মুফতিয়ে আজম শেখুল মশায়েখ, সুলতানুল আউলিয়া হযরত শাহসূফি মাওলানা সৈয়দ মছিহ উল্লাহ (কঃ) মির্জাপুরী প্রকাশ বড় মওলানা সাহেব কেবলা কাবার ৯৭তম বার্ষিক ওরশ শরীফ, মির্জাপুর দরবার শরীফে শাহ্জাদা সৈয়দ শাহাদাত (মঃ)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত ওরশ শরীফের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন: ফরহাদাবাদ দরবারের শাহজাদা মোজাম্মেল হক শাহ্, মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রিয় পর্ষদের সাংগঠনিক সম্পাদক তাজ মোহাম্মদ মিজান, গাউসিয়া হক মন্জিল কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য মীর মোহাম্মদ অলিউল্লাহ, সাহেদ আলী চৌধুরী, আশেকানে গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী বিবিরহাট শাখার সভাপতি হাফেজ আবুল কাশেম, উপদেষ্টা আবুল হোসেন রুমি, আশেকানে গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী মির্জাপুরী খানকা শাখার সভাপতি মোহাম্মদ সাইফুল, মোহাম্মদ মাকসেদুর রহমান দুলাল, মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন জিকু, আবু শাহাদাত মোহাম্মদ সায়েম সুমন, লিয়াকত আলী চৌধুরী, সাংবাদিক বিপ্লব দে, সাংবাদিক ডা. বরুন কুমার আচার্য বলাই, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম। ওরশ শরীফে জিকিরে সেমা পরিবেশন করেন কাওয়াল মোহাম্মদ আবু ছালেহ, আবুল কাশেম আমিরী ও কাওয়াল সিরাজ।

মরক্কোয় তিযানিয়্যা ত্বরিকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত শায়খ আহমদ তিযানী (র) -এর মাজার শরীফের দৃশ্য ...

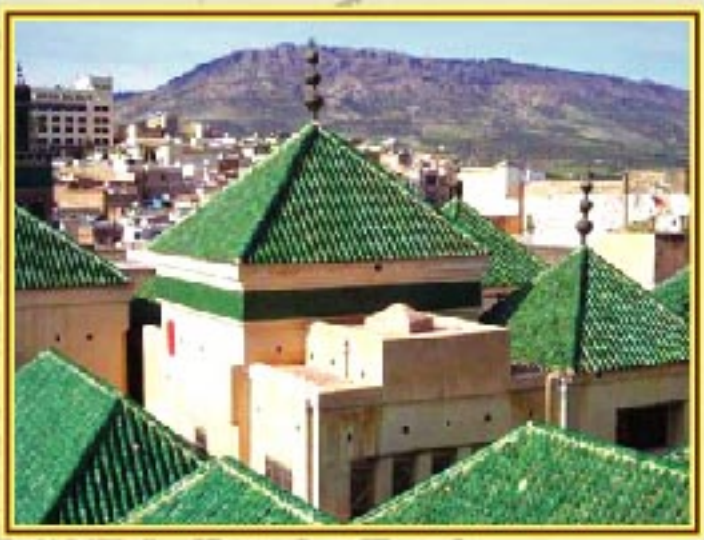

রওজার শরীফের প্যানোরামা

জিয়ারতকারীদের একাংশ

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

স্থাপত্য প্রকল্প :

১. শাপলা নক্শা শোভিত রওজা শরীফ।
২. বাব-এ-শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী তোরণ (নাজিরহাট দরবার গেইট)।

শিক্ষা ও শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প :

১. মাদ্‌রাসা-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী।
২. উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানা।
৩. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি তহবিল।
৪. মাইজভাণ্ডার শরীফ গণপাঠাগার।
৫. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, পটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি।
৬. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, সুয়াবিল, ফটিকছড়ি।
৭. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, মেহেরআটি, পটিয়া।
৮. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী ইসলামিক ইন্‌স্টিটিউট, পশ্চিম গোমদন্ডী, বোয়ালখালী।
৯. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী।
১০. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, ফতেপুর, হাটহাজারী।
১১. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, সদর (চন্দনাইশ)।
১২. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) স্কুল, শান্তির দ্বীপ গহিরা, রাউজান।
১৩. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী এবতেদায়ী ও হেফজখানা, হামজারবাগ, চট্টগ্রাম।
১৪. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৫. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, এয়াকুবদণ্ডী পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৬. মাদ্‌রাসা-এ-বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হেফজখানা ও এতিমখানা, মনোহরদী, নরসিংদী
১৭. জিয়াউল কুরআন ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা ও এবাদতখানা, চরখিজিরপুর (টেক্সঘর) বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৮. বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, হাটপুকুরিয়া, বটতলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।
১৯. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী, বারমাসিয়া, বৈদ্যেরহাট, ভুজপুর, চট্টগ্রাম।

দাতব্য চিকিৎসাসেবা প্রকল্প :

১. হোসাইনী ক্লিনিক (মাইজভাণ্ডার শরীফ)।

দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প :

১. মূলধারা সমাজকল্যাণ সমিতি (রেজিঃ নং-চট্টগ্রাম ২৪৬৮/০২)।
২. প্রত্যাশা সঞ্চয় প্রকল্প।
৩. যাকাত তহবিল।
৪. দুস্থ সাহায্য তহবিল।

মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনাপ্রকল্প :

১. মাসিক আলোকধারা।
২. মাইজভাণ্ডারী একাডেমী।

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প :

১. মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী।
২. মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন।

জনসেবা প্রকল্প :

১. নাজিরহাট তেমুহনী রাস্তার মাথায় যাত্রী ছাউনী ও এবাদতখানা।
২. শানে আহমদিয়া গেইট সংলগ্ন যাত্রী ছাউনী।
৩. ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরীফ)।